ইউনিট ৫

কোম্পানির শাসন (১৭৬৫-১৮৫৭ খ্রিঃ)

ভূমিকা

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ কর্তৃত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিউয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম অধ্যায়ের সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর ক্রমে কর্ণাটকে ফরাসি কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা সফলতার সঙ্গে মোকাবেলা এবং বাংলায় নবাবদের হাত হতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা। এভাবে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমেই দিন দিন বাড়তে থাকে। বাংলার বিপুল ধন-সম্পদ একদিকে যেমন কোম্পানির উন্নতি ও অগ্রগতিতে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি বাংলাকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের এক সুবর্ণ সুযোগ আসে। সুযোগের সঠিক সদ্ব্যবহার করতে ইংরেজদের জুড়ি মেলা ভার। দেশীয় রাজশক্তিগুলোর অবক্ষয় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ও অনৈক্য ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রশস্ত করে। উপমহাদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে ইংরেজদের এ সময় তিনটি প্রধান বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ওয়েলেসলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিষ্কন্টক করেন। এরপর মারাঠা নেতাদের কলহ ও অনৈক্যের সুযোগে ইংরেজরা মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের পথে আরও একটি বিরাট বাধা অতিক্রম করে। শেষ যে শক্তিটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল তা হলো রণজিত সিংহের নেতৃত্বে শিখ শক্তি। কিন্তু শিখ শক্তিও ইংরেজদের উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসার থামাতে পারেনি। ফলে উপমহাদেশে ইংরেজগণ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়। এ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেস্‌লি ও লর্ড ডালহৌসির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ।

পাঠ ১

ওয়ারেন হেস্টিংস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি —

- ওয়ারেন হেস্টিংসের ক্ষমতা লাভের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়ারেন হেস্টিংসের সীমান্ত নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- হেস্টিংসের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- হেস্টিংসের অর্থ সংগ্রহ নীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হেস্টিংসের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ক্ষমতা লাভ

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তি সুসংহত করণে হেস্টিংসের অবদান অপরিসীম। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি কলকাতায় কোম্পানির একজন লেখক বা কেরাণী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং নিজ কর্মদক্ষতা গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাশিম বাজারের 'রেসিডেন্ট' পদে উন্নীত হন। তিনি ফরাসি ও বাংলা ভাষা ভাল করে জানতেন, উর্দু ও আরবির সঙ্গে ও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর শাসন কালকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমপর্ব: ১৭৭২-১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গভর্নর হিসেবে আর দ্বিতীয় পর্ব, ১৭৭৪-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর জেনালের হিসেবে।

গভর্নর ও গভর্নর জেনারেল হিসেবে হেস্টিংস

ওয়ারেন হেস্টিংস

সীমান্ত নীতি

গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে হেস্টিংস সর্ব প্রথমেই সীমান্ত নীতি বিষয়ে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি লক্ষ করেন যে ইতোমধ্যে কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়েছে। সুতরাং উপমহাদেশে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়ী করতে হলে দেশীয় রাজাদের যথাসম্ভব ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তোলা প্রয়োজন। এজন্য তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সূচনা করেন যা পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।

বারানসীর সন্ধি

ওয়ারেন হেস্টিংস ইংরেজদের শত্রু মারাঠাদের আশ্রয়ে বাস করার অজুহাতে সম্রাট শাহ আলমকে দেয় বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বন্ধ করে দেন এবং সম্রাটের নিকট হতে 'বারানসীর সন্ধি' দ্বারা এলাহাবাদ ও কারা জেলা দু'টি অযোধ্যার নবাবকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রদান করেন। এভাবে হেস্টিংস অযোধ্যার শক্তি বৃদ্ধি করে একে মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে একটি শক্তিশালী বাফার স্টেট হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

রোহিলা যুদ্ধ

বর্তমান যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীগণ রোহিলা আফগান নামে পরিচিত ছিল। রোহিলাদের সাথে আগে থেকেই অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার তেমন সদ্ভাব ছিল না। তিনি রোহিলাখণ্ড জয়ের জন্য ৪০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লর্ড হেস্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর সাহায্যে নবাব সুজাউদ্দোলা মিরণ কাটরার যুদ্ধে রোহিলাদের পরাজিত করে রোহিলাখণ্ড দখল করে নেন। যুদ্ধে রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমত খান নিহত হন। রোহিলাখণ্ড নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়।

রোহিলাখণ্ডের উপর নবাব সুজাউদ্দৌলার অধিকার প্রতিষ্ঠা

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে তাঁর সীমান্ত বা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক প্রধান ঘটনা হলো ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫ খ্রি:)। মারাঠাদের উত্তরাধিকার সংঘর্ষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপের ফলেই ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের শুরু হয়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ শুরু হলে হেস্টিংস ডাইরেক্টর সভার নির্দেশে মারাঠা সর্দার রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষে যান। তেলেগাঁও এর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়াড়গাঁও এর সন্ধি মোতাবেক তাঁরা রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করতে এবং বিজিত রাজ্যগুলো মারাঠাদের নিকট ফেরত দিতে

সালবই-এর সন্ধি

রাজী হয়। কিন্তু লর্ড হেস্টিংস এ সন্ধি অস্বীকার করে সেনাপতি গর্ডাডের সহায়তায় আহমেদ নগর ও বেসিন দখল করেন। পুনার যুদ্ধে মারাঠাদের নিকট গর্ডাড পরাজিত হলেও সেনাপতি পপহামের নেতৃত্বে ইংরেজগণ গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করেন। অবশেষে, সিন্ধিয়ার প্রচেষ্টায় ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে 'সালবই-এর সন্ধি' (১৭৮২ খ্রি:) স্বাক্ষরিত হয়।

ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

ওয়ারেন হেস্টিংসের পররাষ্ট্র নীতির অপর প্রধান ঘটনা ছিল ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। মহীশূরের রাজা কৃষ্ণ রায়কে নামে মাত্র ক্ষমতায় রেখে তাঁর অত্যাচারী মন্ত্রী নানরাজ ও ভাই দেবরাজ প্রকৃত ক্ষমতা দখল করেন। অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান হায়দর আলী নানরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং মহীশূরকে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। হায়দর আলীর অভ্যুত্থানকে ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম এ তিন শক্তি সন্দেহের চোখে দেখেন। এ তিন শক্তি

মাদ্রাজ সন্ধির মাধ্যমে ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি

মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে হায়দর আলী তাঁর কূটবুদ্ধির দ্বারা মারাঠা ও নিজামকে ইংরেজপক্ষ ত্যাগ করিয়ে নিজ পক্ষে আনতে সক্ষম হন। ফলে হায়দরের নিকট বোম্বাই ও মাদ্রাজের ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'মাদ্রাজের সন্ধির' দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে। উভয়পক্ষ একে অন্যের দখলকৃত রাজ্য ও যুদ্ধবন্দী ফেরত দিতে রাজী হয়। তদুপরি হায়দর আলী অন্য কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হলে ইংরেজ বাহিনী তাঁকে সাহায্য করবে বলে ইংরেজদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে।

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় হায়দর আলী ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি পরবর্তীকালে ইংরেজগণ অমান্য করে। এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হায়দর আলী ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্র ধরে উপমহাদেশে ইংরেজগণ ফরাসি কর্তৃত্বাধীন মাহে বন্দরটি দখল করে নেয় যা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হায়দর আলী এর প্রতিবাদ করে ব্যর্থ হন। অগত্যা তিনি নিজামের সংগঠনে যোগদান করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

ব্যাঙ্গালোরের সন্ধির মাধ্যমে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে হায়দর আলীর মৃত্যু ঘটলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং বেদনোর ও ব্যাঙ্গলোর অধিকার করেন। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে সম্পাদিত 'ব্যাঙ্গলোরের সন্ধির' মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটেনি।

অর্থনৈতিক সংস্কার

উপমহাদেশের ইতিহাসে নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজের জন্য হেস্টিংসের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর ক্ষমতা লাভের আগে এদেশে কোম্পানির শাসনব্যবস্থা নানান সমস্যা ও দুর্নীতিগ্রস্থ ছিল। গভর্নর হিসেবে তিনি এ সকল সমস্যা ও দুর্নীতির সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যে প্রশাসনিক স্থাপত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তার উপর অপর প্রশাসকগণ একটি বিশাল সৌধ নির্মাণ করতে সক্ষম হন।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ

রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং দিউয়ানী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন হেস্টিংসের অভ্যন্তরীণ শাসন নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে শাসন ও রাজস্ব বিভাগ কোম্পানির অধীনে স্থাপন করেন এবং অত্যাচারের অভিযোগে রেজা খান ও সেতাব রায়কে পদচ্যুত করেন। নায়েব দিওয়ানের পদ বিলোপ করা হয়। রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি দূর করতে ও এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হতে

কলকাতায় স্থানান্তর করে একটি রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধির জন্য তিনি পাঁচ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ মূল্যে জমিদারী ইজারা দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। যা 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদারগণ প্রজাদের উপর জোর জুলুম করে অর্থ আদায় করতো। ফলে প্রজাদের দু:খ দুর্দশার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি পরে একাসালা বন্দোবস্তও প্রবর্তন করেন।

পাঁচসালা বন্দোবস্ত

বাণিজ্য সংস্কার

হেস্টিংস কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগে কিছু সংস্কার চালু করেন। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। দস্তক প্রথা আইনত লোপ পায়। তিনি মাল চলাচলের সুবিধার জন্য কলকাতা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা ছাড়া সমস্ত শুল্ক চৌকি বন্ধ করে দেন। ফলে জমিদারগণ ইচ্ছামত শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা হারায়। কোম্পানির স্বার্থে কাপড় তৈরির জন্য তাঁতিদের উপর তিনি জুলুম নিষিদ্ধ করেন। তিনি ভূটান ও তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

বিনাশুল্কে বাণিজ্য প্রথা নিষিদ্ধ

বিচার সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগের সংস্কার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মুগল বিচার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে তাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়বিচারমূলক করার নীতি গ্রহণ করেন। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় আইন চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেন যাতে শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তিনি বিচার বিভাগকে রাজস্ব বিভাগ হতে পৃথক করে প্রত্যেক জেলায় একটি করে দিওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। ইংরেজ কালেক্টর ও দেশীয় বিচারকগণ যথাক্রমে দিওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিচারক ছিলেন। তিনি দিওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীলের জন্য 'সদর দিওয়ানী আদালত' ও 'সদর নেজামত আদালত' নামে দু'টি উচ্চ আদালত স্থাপন করে বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। দিওয়ানী আদালত গভর্নর ও তাঁর পরিষদের দু'জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। ফৌজদারী আদালতের প্রধান ছিলেন নবাব বা নাজিম। তিনি দেশীয় কাজী বা মুফতীর সাহায্যে বিচার কাজ পরিচালনা করতেন এবং হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে বিচারের ব্যাখ্যা কাজ চালাতেন।

দিউয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন

অর্থ সংগ্রহের নীতি

হেস্টিংস এক চরম দুর্যোগময় মূহূর্তে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি এদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণকে বাঁচাতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট হতে দশ লক্ষ পাউন্ড ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। আর, এ কারণে তিনি ঋণ পরিশোধ ও আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যয়-সংকোচন নীতি গ্রহণ করে গর্হিত ও নীতি বিরুদ্ধ কাজে হাত দেন।

সম্রাট ও নবাবের বার্ষিক ভাতা হ্রাস

তিনি বাংলার বৃত্তি প্রাপ্ত নবাবের বার্ষিক ভাতা অর্ধেক কমিয়ে দেন। আগেই জেনেছেন, তিনি সম্রাট শাহ্ আলমের বার্ষিক ভাতা বন্ধ করে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কারা ও এলাহাবাদ জেলাদ্বয় জোরপূর্বক দখল নেন এবং ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে প্রদান করেন। উপরন্তু হেস্টিংস ৫০ লক্ষ টাকা এবং ইংরেজ সৈন্যদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের বিনিময়ে নিরাপরাধ রোহিলাদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাবের পক্ষাবলম্বন করেন। এমনকি তাঁর অর্থ উপার্জনের লালসা হতে বারানসীর রাজা চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমগণও রেহাই পায়নি।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট (১৭৭৩ খ্রি:)

এতদিন উপমহাদেশে কোম্পানির যাবতীয় কাজ প্রথমে ইংল্যান্ডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস পরিচালনা করত। কালক্রমে এদেশে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন কাজেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ বিশৃংখলা দূর করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সর্বপ্রথম উপমহাদেশের শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করে। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে শাসন আইন নামে একটি আইন পাস করেন যা 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' নামে ইতিহাসে বিখ্যাত।

গভর্নর থেকে গভর্নর জেনারেল

উপমহাদেশের শাসন কার্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ

রেগুলেটিং এ্যাক্ট এর দ্বারা বোর্ড অব ডাইরেকট্রসকে ব্রিটিশ সরকারের নিকট কোম্পানির শাসন ও রাজস্ব সম্পর্কে সকল তথ্য পাঠাতে হতো। বাংলার গভর্নরকে গভর্নর জেনারেল আখ্যা দেয়া হয়। গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট একটি 'কাউন্সিল' গঠিত হয় এবং সবার সমান অধিকার দেয়া হয়। এই রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। এ রেগুলেটিং এ্যাক্ট এর দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অবশ্য কালক্রমে এই এ্যাক্টের খারাপ দিকগুলো ১৭৮১-১৭৮৪ ও ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে আইন দ্বারা সংশোধিত হয়।

গভর্নর থেকে গভর্নর জেনারেল

চার্টার এ্যাক্ট (১৭৮৪ খ্রি:)

গভর্ণর জেনালের হেস্টিংস ও প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থের উদোগে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট পাস হয়। এ আইনে সুপ্রীম কোর্ট এবং গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছিল।

পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট (১৭৮৪ খ্রি:)

বোর্ড অব কন্ট্রোল

রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট একটি আইন পাস করেন যা ইতিহাসে 'পিট এর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট' নামে পরিচিত। এ আইন দ্বারা পার্লামেন্ট উপমহাদেশ শাসনের সকল ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ আইনের বলে ব্রিটিশ সরকারের নিযুক্ত ৬ জন এবং ইংল্যান্ডের মন্ত্রী সভার ১ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল' এর উপর উপমহাদেশ শাসন ও পর্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বাড়ানো হয়। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এছাড়া, কোম্পানির তিনজন ডাইরেক্টর নিয়ে একটি 'সিক্রেট কমিটি'ও গঠিত হয়।

সিক্রেট কমিটি

পদত্যাগ ও ইমপীচমেন্ট

হেস্টিংসের কার্যকালের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ ও অপবাদ প্রকাশ পেতে থাকে। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যান। উইলিয়াম পিট ও লর্ড জান্ডাসের চেষ্টার ফলে হেস্টিংসকে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। বিশেষ করে চৈৎ সিংহ, অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অসদাচারণ ও অত্যাচারের অভিযোগ ছিল গুরতর। সাত বৎসর ধরে বিচারের পর হেস্টিংস অভিযোগ হতে মুক্ত হলেন বটে, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যয় সংকুলান করতে গিয়ে তিনি একেবারে সর্বস্বান্ত হলেন। পিট ও ডান্ডাসের বিরোধিতার ফলে তাঁর ভাতাও বন্ধ করে দেয়া হয়।

শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক

ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় শিক্ষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার আমলে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৭৮১)। গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। হেস্টিংস এর পৃষ্ঠপোষকতায় চার্লস উইলকিন্স বাংলায় ছাপাখানা (প্রেস) স্থাপন করে।

কৃতিত্ব

হেস্টিংসের জীবনের শেষ পরিণতি দু:খজনক হলেও এ কথা মানতে হবে যে বাংলা যখন দ্বৈত শাসনের ফলে জর্জরিত, আমেরিকা যখন ব্রিটিশ শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন, পররাষ্ট্র নীতিতে ইংল্যান্ডের গৌরব যখন ক্ষুণ্ন, ভোঁসলে, নিজাম, হায়দর-এর আক্রমণে যখন ইংরেজ প্রভুত্বের ভিত্তি প্রকম্পিত, মন্বন্তরে জনপদ যখন বিরান, কোম্পানির কোষাগার যখন শূন্য প্রায়, তখন

হেস্টিংস ইংরেজ কোম্পানির মর্যাদা ও শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ধৈর্য্য, সাহস ও দৃঢ় মনোবল দ্বারা তিনি শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

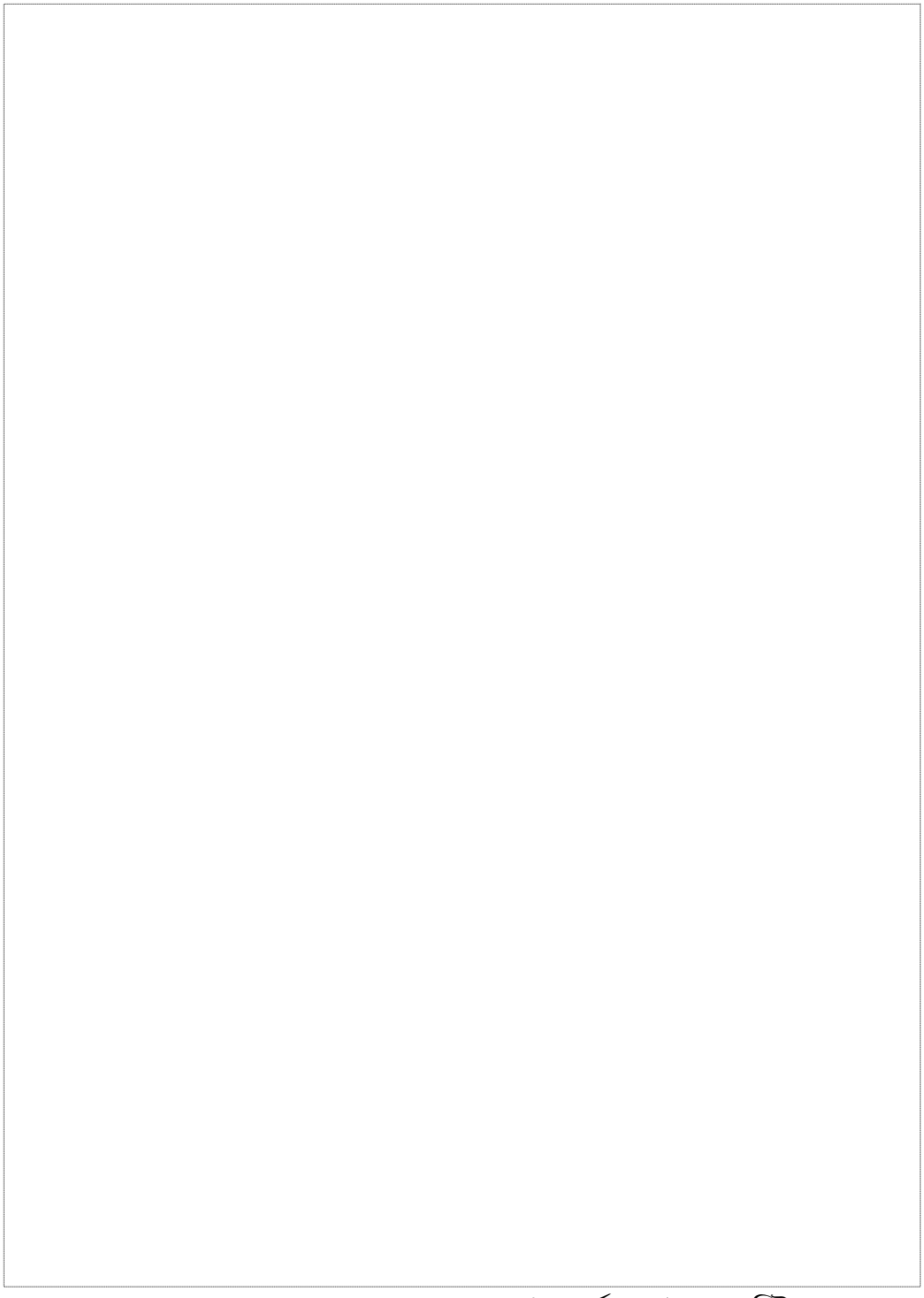

ভারতবর্ষ, ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়

সার-সংক্ষেপ

উপমহাদেশে বৃটিশ শক্তিকে সুদৃঢ় করার পেছনে হেস্টিংসের অবদান অনস্বীকার্য। ক্লাইভের শাসন ব্যবস্থার ফলে যখন বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ, ঠিক সে মুহূর্তে হেস্টিংস এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। হেস্টিংসের সীমান্ত নীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোম্পানির অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও বিস্তার। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হেস্টিংসের নীতি ছিল রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েও ব্যক্তিগতভাবে হেস্টিংস ছিলেন অসচ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, অর্থলোভী ও প্রতিহিংসাপরায়ন। তবে এ উপমহাদেশে যে সমস্ত শাসক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হেস্টিংসের অবদানই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। হেস্টিংস যখন ক্ষমতায় আসেন তখন কোম্পানি ছিল রাজস্ব আদায়কারী একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। তিনি যখন কর্মভার ত্যাগ করে দেশে যাত্রা করেন তখন কোম্পানি এ উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তাই হেস্টিংসকে উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন —
   ক. রবার্ট ক্লাইভ খ. ওয়ারেন হেস্টিংস
   গ. লর্ড কর্ণওয়ালিস ঘ. লর্ড ডালহৌসী

২. জমিদারদের সাথে পাঁচসালা প্রথা প্রবর্তন করেন —
   ক. লর্ড কর্নওয়ালিস খ. লর্ড ক্লাইভ
   গ. লর্ড ওয়েলেসলী ঘ. লর্ড হেস্টিংস

৩. লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস পদত্যাগ করেছিলেন —
   ক. ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে

৪. রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস হয় —
   ক. ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. ওয়ারেন হেস্টিংসের সামরিক নীতির বর্ণনা দিন।
২. ওয়ারেন হেস্টিংসের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সংস্কারের বিবরণ দিন।
৩. বিচারের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংস কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।
৪. ভারতের শাসন কার্যে বৃটিশ পার্লামেন্ট কিভাবে ভূমিকা রেখেছিল?

পাঠ ২

লর্ড কর্ণওয়ালিস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি —

- লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগের সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লর্ড কর্ণওয়ালিসের পুলিশ বিভাগের সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- লর্ড কর্ণওয়ালিসের বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভূমি রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- লর্ড কর্ণওয়ালিসের পররাষ্ট্রনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

দায়িত্ব গ্রহণ

ওয়ারেন হেস্টিংস পদত্যাগ করে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে স্যার জন ম্যাকফারসন এক বৎসর অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসেবে কাজ করেন। হেস্টিংস এর কার্যকলাপ সে সময় ইংল্যান্ডের জনমনে এ ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে, কোম্পানির দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত কোন ব্যক্তিকে আর গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা সমীচীন নয়। আর এ কারণেই বোর্ড অব কন্ট্রোল এর সভাপতি হেনরী ডান্ডাস ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট-এর ঘনিষ্ট বন্ধু লর্ড কর্ণওয়ালিস তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে গভর্নর জেনারেল হিসাবে উপমহাদেশে আসেন ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইংল্যান্ডের এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সৎচরিত্রের অধিকারী। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে সততা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করার জন্য তাঁকে স্থায়ী গভর্নর জেনারেল করে এদেশে প্রেরণ করেন। তাই প্রয়োজনে তিনি শাসন পরিষদের মতামত উপেক্ষা করে নিজ সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। একাধারে তিনি গভর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা লাভ করেন। পিট-এর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে কর্ণওয়ালিসকে এদেশে রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধনীতি হতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। তাই লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজ্য বিস্তরের চেয়ে বিজিত রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

স্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ

প্রশাসনিক সংস্কার

সংস্কারমূলক কাজের জন্য কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল এদেশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হেস্টিংস প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে এ উপমহাদেশীয় শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন।

তাই লর্ড কর্ণওয়ালিস সর্বপ্রথম কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে ব্যক্তিগত বাণিজ্য কিংবা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঠিক একই সময় তিনি কর্মচারী কার্য নীতি ব্যাখ্যা করে "কর্ণওয়ালিস কোড" নামে কতগুলো নিয়ম কানুন চালু করেন। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের আনুগত্য সততা ও নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিয়ে শাসন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করেন এবং সার্বক্ষণিক কাজ করার নির্দেশ দেন। এভাবে তিনি কোম্পানির কমচারীদের কার্য নীতি ও কার্য পদ্ধতির পরিবর্তন করে 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের' ঐতিহ্য গঠনে সাহায্য করেন।

কর্ণওয়ালিস কোড-এর প্রচলন

বিচার সংস্কার

রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণ

লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। পি.ই. রবার্টস এর মতে দিওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচার সম্পর্কে হেস্টিংস যে শাসন ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, কর্ণওয়ালিস তা সম্পন্ন করেন। কর্ণওয়ালিস রাজস্ব ও বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করে পৃথক কর্মচারীদের উপর এর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন। আগে কালেক্টরগণ রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। কর্ণওয়ালিসের নতুন ব্যবস্থায় তাঁদের কার্য শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

জেলা কোর্ট প্রতিষ্ঠা

তিনি দিওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত দেশীয় মুনসেফ ও সদর আমিনের অধীনে স্থাপন করেন। সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয়ের উপরে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা-কোর্ট স্থাপন করা হয়। জেলা কোর্টগুলো এক একজন ইংরেজ জজের অধীনে ছিল এবং তাঁরা এদেশীয় আইনজ্ঞদের সাহায্যে বিচার করতেন। নিম্ন আদালত হতে আপীলের জন্য কর্ণওয়ালিস কলকাতা, মুর্শিদবাদ, পাটনা ও ঢাকায় চারটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করে তাতে ইংরেজ জজ নিযুক্ত করেন। দিওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ বিচারালয় সদর দিওয়ানী আদালত নামে পরিচিত ছিল। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল এই বিচারালয়ের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আদালত 'সদর নিজামত আদালত' নামে পরিচিত ছিল। হেস্টিংস এই আদালত মুর্শিদাবাদে স্থাপন করেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের সদস্য এ আদালতের বিচারক ছিলেন। ফৌজদারী বিচারের জন্য কর্ণওয়ালিস চারটি 'সেসন আদালত' স্থাপন করেন। প্রত্যেক আদালতে দু'জন করে ইংরেজ জজ ও কতিপয় এদেশীয় মুসলমান ও হিন্দু আইনজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে বিচার কার্য চলতো। এ আদালত নিজ নিজ এলাকার জেলাগুলোতে ঘুরে ঘুরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতো বলে এ আদালতগুলোকে 'ভ্রাম্যমান আদালত' বলা হতো। ভ্রাম্যমান বিচারালয়ের বিচারকগণ বছরে দু'বার করে বিভিন্ন জেলায় যেতেন এবং স্থানীয় ফৌজদারি বিচার কার্য সম্পাদন করতেন। পূর্বে কোন কোন ক্ষেত্রে যে সকল নিষ্ঠুর দন্ড দানের রীতি ছিল কর্ণওয়ালিস তা উঠিয়ে দেন। কর্ণওয়ালিস হত্যার অপরাধকে সমাজ বিরোধী বলে ঘোষণা করেন এবং সকল বৈষম্যমূলক ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে আইনের চোখে সকলকে সমান অধিকার দান করেন।

'সেসন আদালত' বা ভ্রাম্যমান আদালত

বাণিজ্য ব্যবস্থা

লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথম হতেই কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণ কোম্পানির স্বার্থ না দেখে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত হয়। পূর্বে এ দেশ হতে যে সমস্ত পণ্য ইংল্যান্ডে রফতানি করা হতো তা ইংরেজ কর্মচারিগণ ঠিকাদার হিসেবে দেশীয় বণিকদের নিকট থেকে ক্রয় করত। ফলে কর্মচারিদের লাভ হতো বটে, কিন্তু কোম্পানি বিরাট লভ্যাংশ হতে বঞ্চিত হতো। তাই কর্ণওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থে সরাসরি দেশীয় বণিকদের নিকট থেকে মালামাল সংগ্রহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। কোম্পানির কর্মচারিরা দেশীয় বণিকদের উপর অত্যাচার করত। তাই কর্ণওয়ালিস দেশীয় বণিকদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য কোম্পানির কর্মচারিদের নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা কোম্পানি ও দেশীয় বণিকদের উপকার সাধন করেছিল।

দেশি বণিকদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ

পুলিশ ব্যবস্থা

পুলিশ ব্যবস্থায় বিদেশীকরণ

কর্ণওয়ালিস এদেশীয় শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রদেশগুলোকে জেলায় এবং জেলাগুলোকে থানায় বিভক্ত করেন। প্রতি থানায় একজন করে এদেশীয় দারোগা নিযুক্ত করা হয়। জেলার সর্বময় কর্তা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর উপর পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট জেলার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। পূর্বে জামিদারগণের উপর নিজ এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল তা প্রত্যাহার করা হয় এবং তাদের রক্ষি বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়। পুলিশ বাহিনীর জন্য নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট নিযুক্ত করা হয়। এভাবে পুলিশ ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনায়ন করা হয়।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

দশসালা বন্দোবস্ত

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনামলের ভূমি রাজস্ব সংস্কার একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রবর্তিত জমির পাঁচসালা ও একসালা বন্দোবস্তের ভুলত্রুটি নিরসনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস জমির দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই সংস্কার ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে জমিদাররা জমির স্থায়ী মালিক হন এবং তাঁদের দেয় করের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা নিয়মিত কর প্রদান সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে জমির মালিক হয়ে যান। তবে এ ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের দুর্দশা বেড়ে যায় ও জমির উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ ব্যবস্থায় সূর্যাস্ত আইনের বলে বহু জমিদারী নিলামে উঠে এবং বহু নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যা এদেশে বিদেশী শাসকদের হাতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

পররাষ্ট্রনীতি

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

পিট এর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এর শর্তানুযায়ী কর্ণওয়ালিসকে উপমহাদেশে রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি ক্ষেত্র বিশেষে তা পালন করেন নি। মারাঠারা অযোধ্যায় গোলযোগ সৃষ্টি করলে কর্ণওয়ালিস সিন্ধিয়াকে সাহায্য করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের প্রবল শত্রু মহীশূরের টিপু সুলতানকে দমন করার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামের সাথে মিত্রতা করেন। ফলে টিপু ব্যাঙ্গালোরের সন্ধির (১৭৮৪ খ্রি:) শর্তাবলী ভঙ্গ করে ইংরেজদের মিত্র রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন। এভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয় (১৭৮৯ খ্রি:)।

টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে সন্ধি

লর্ড কর্নওয়ালিস মারাঠা এবং নিজামের সাথে এক হয়ে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরুদ্ধ করলে, টিপু ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির শর্তানুসারে টিপু মহীশূর রাজ্যের একাংশ এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ ইংরেজদের প্রদান করতে বাধ্য হলেন। ভবিষ্যত আচরণের জামিন হিসেবে টিপু তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। এভাবে কর্ণওয়ালিস উপমহাদেশের দক্ষিণ ভাগে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের সক্ষম হন।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানির উপমহাদেশে বিশ বৎসর বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় কোম্পানিকে এদেশে বাণিজ্যের অধিকার দেয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে এক তীব্র আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের বাণিজ্য সকল ইংরেজ বণিক এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত করে

কোম্পানীর একচেটিয়া বানিজ্যের অধিকার

দেয়া। কিন্তু সে দাবী অনুযায়ী কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার উঠিয়ে দিলে অন্যান্য ইংরেজ বণিকদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের এদেশীয় বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটবে, এ যুক্তি দেখিয়ে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট দ্বারা আরও বিশ বৎসরের জন্য কোম্পানিকে এদেশে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার দেয়া হল।

সার-সংক্ষেপ

বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ এর সভাপতি লর্ড ডান্ডাস এবং প্রধানমন্ত্রী পিট এর অন্তরঙ্গ বন্ধু লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হিসেবে ক্ষমতায় বসেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা সংস্কারমূলক কার্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিচার ও ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনেন। 'কর্নওয়ালিস কোড' দ্বারা কার্য নীতির পরিবর্তন সাধন কোম্পানির কর্মচারীদের ঐতিহ্য গঠনে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া ইংরেজ যুগে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস নামে যে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা প্রসিদ্ধ হয়েছিল তার প্রথম পত্তন কর্ণওয়ালিস করেছিলেন। তাঁর সময়েই পুলিশ ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনায়ন করা হয়। তাই লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল উপমহাদেশের ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন —
   ক. ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে

২. প্রথম ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন করেন —
   ক. লর্ড হেস্টিংস খ. লর্ড কর্ণওয়ালিস
   গ. লর্ড ক্লাইভ ঘ. লর্ড ক্লাইভ

৩. তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয় —
   ক. ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে

৪. সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন করেন —
   ক. লর্ড ক্লাইভ খ. লর্ড হেস্টিংস
   গ. লর্ড কর্ণওয়ালিস ঘ. লর্ড বেন্টিংক

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রশাসনিক সংস্কারের বিবরণ দিন।
২. কর্ণওয়ালিসের বিচার ব্যবস্থায় কি সংস্কার করেছিলেন।
৩. কর্ণওয়ালিসের পুলিশ ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।
৪. কর্ণওয়ালিসের পররাষ্ট্রনীতি কি ছিল?

পাঠ ৩

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও এর ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি —

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস আটচল্লিশ বছর বয়সে বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকাল নানাবিধ সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা নিশ্চিত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত এক নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব কোম্পানির নিকট পেশ করেন যা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে অনুমোদন লাভ করে। তা ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ বন্দোবস্তের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর পক্ষে কর্ণওয়ালিসের যুক্তি ছিল এই যে, ভূমি ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এলে স্বাভাবিকভাবেই জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজিবিনিয়োগ করবেন এবং নিজ স্বার্থেই জমিদার তাঁর উদ্বৃত্ত অর্থ জমির উন্নয়নে ব্যবহার করবেন। তার ফলে জমি উন্নত হবে, কৃষিতে উৎপাদন বাড়বে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কর্ণওয়ালিস জমিদার পুত্র ছিলেন বলেই মনে করেছিলেন যে, ইংল্যান্ডে যেমন ভূম্যধিকারী সমাজ কৃষিতে বিপ্লব সাধন করেছিল, তেমনি উপমহাদেশেও অনুগত জমিদার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব সম্ভব হবে। তাই তিনি প্রজার দিকে তেমন নজর দিলেন না। তিনি এমন এক অভিজ্ঞ জমিদার শ্রেণী খাড়া করে দিতে চাইলেন যারা শত বাধার মধ্যেও ইংরেজদের অনুগত থাকবে। আর এমনিভাবেই এ শ্রেণী হবে উপমহাদেশে ইংরেজ-রাজের রাজনৈতিক ভিত্তি।

বৃটিশ অনুগত জমিদার শ্রেণী তৈরির চেষ্টা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি

কর্ণওয়ালিস যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার অন্ত ছিল না। কোন একক কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়নি। এর পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে।

পূর্ববর্তী গভর্নর হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য যে পাঁচসালা বন্দোবস্তের (১৭৭২ খ্রি:) প্রথা চালু করেন, তাতে ভূমি রাজস্ব নিলাম করা হতো এবং যিনি ডাক পেতেন তিনিই জমির মালিক হতেন। এ ব্যবস্থায় উচ্চহারে ডাক নিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিলেও সে অনুপাতে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় ও সময়সীমা থাকায় জমিদারগণ প্রজা পীড়ন করত কিন্তু উন্নয়ন করত না। ফলে কৃষকগণ জমি চাষ না করায় তা বছর ধরে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকত ও জমির দাম কমে যেত। এ সব কুফল দেখা দেয়ায় হেস্টিংস জমিদারগণের সাথে 'একসালা' ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু এতেও সরকার, জমিদার ও প্রজাদের অসুবিধা দেখা দেয়ায় কর্ণওয়ালিস

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন (১৭৮৯ খ্রি:)। সাথে সাথে কর্নওয়ালিস এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে বলেও আশ্বাস দেন। এ বিষয়ে স্যার জন শোরের সাথে কর্ণওয়ালিসের নানা তর্ক বির্তক হয়। অবশেষে কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর অনুমোদন লাভের পর কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন।

সূর্যাস্ত আইন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং জমির উপর জমিদারদের মালিকানা ক্ষমতা এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জমি হস্তান্তর বা দান করার ক্ষমতাও তাঁরা পান। জমিদারগণ নিজ খুশী মত শর্ত সাপেক্ষে জমি পত্তন বা ইজারা দেয়ার ক্ষমতাও লাভ করেন। কেবল শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা, বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা তাঁদের হাতে দেয়া হয়নি। তাছাড়া জমির রাজস্ব কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দিতে সক্ষম না হলে জমি নিলামে বিক্রি করার ক্ষমতা সরকারের হাতেই রয়ে গেল। তাই এই নিয়ম সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলের চেয়ে কুফলই ছিল বেশি।

সুফল

প্রথমত: জমিদারগণ জমির স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ করে জমির উন্নতি বিধানের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে, জমির উৎপাদন শক্তি ও মূল্য বেড়ে গেল। **দ্বিতীয়ত:** সরকার প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়-সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নতুন জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে লাগলেন। **তৃতীয়ত:** দেশের এই প্রভাবশালী জমিদারগণ ইংরেজ সরকারের সহায়তা করায় ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। **চতুর্থত:** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করে বাংলার সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনেও বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। **পঞ্চমত:** বিত্তবান জমিদারগণ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, জলাশয় ও দিঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পালা পার্বন ও সামাজিক উৎসবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গ্রাম বাংলার গ্রামীন জীবনকে সচল করে রেখেছিলেন। **ষষ্ঠত:** এ সময়েই জমিদার শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সংযোগের মাধ্যমরূপে কৃষিজমির উপ-স্বত্বভোগী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। **সপ্তমত:** আয় সুনিশ্চিত হওয়াতে কোম্পানির বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুবিধা হয়। অস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত কুফলগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা দূর করা সম্ভব হয়েছিল।

কুফল

প্রথমত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সঠিক জরিপের মাধ্যমে জমি ভাগ না হওয়ায় নিষ্কর জমির উপর বেশি করে রাজস্ব নির্ধারিত হয় এবং জমির সীমানা নির্ধারিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত: এই ব্যবস্থার ফলে পরবর্তীকালে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হয় নাই। ফলে সরকার বর্ধিত রাজস্বের লাভ হতে বঞ্চিত হয়।

তৃতীয়ত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ প্রজা ও কৃষকদের কোন উন্নতি হয়নি। জমিতে প্রজাদের পুরাতন স্বত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং তারা জমিদারদের করুণার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। জমিদার ইচ্ছা করলে যে কোন সময় উচ্ছেদ করতে পারতেন। পরিশ্রম করেও কৃষকগণ যথাযথ পারিশ্রমিক পেতো না।

চতুর্থত: সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতার জন্য অনেক বড় বড় জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে বর্ধমানের, নাটোরের, দিনাজপুরের, নদীয়ার, বীরভূমের ও বিষ্ণুপুরের জমিদারী

উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের জমিদারী ছাড়া আর অন্য সব জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম সাত বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়।

পঞ্চমত: জমিদারীর স্বত্ব ও আয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নায়েব গোমস্তাদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে জমিদারগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস শুরু করে। ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে।

ষষ্ঠত: জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করে অনায়াসে সম্পদ ও মর্যাদা লাভের আশায় শিল্প-বাণিজ্য পরিত্যক্ত হতে থাকে। ফলে গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প ও শ্রম শিল্প ক্রমশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সপ্তমত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার মুসলমানগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। উইলিয়াম হান্টারের মতে, "গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমান পরিবারগুলোর অস্তিত্ব হয় পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে, না হয় ইংরেজদের সৃষ্ট নতুন ধনী সমাজের নীচে এ সময় ঢাকা পড়েছে।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিনতি

এ সময় নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব আইন দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করেন এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারা জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে দেন। পাকিস্তান অর্জনের পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়ে দিয়ে প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি জমির বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জমিদার পুত্র লর্ড কর্ণওয়ালিস যে আশায় এ প্রথা চালু করেছিলেন তাঁর সে আশা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছিল।

সার-সংক্ষেপ

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেসিংসের পরে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। কর্ণওয়ালিস হেস্টিংস কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনার অসুবিধাগুলো লক্ষ করে যাতে ভবিষ্যতে আর কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য এক নতুন প্রথার প্রবর্তন করেন যা ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ছিল ইংরেজদের একটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা। কর্নওয়ালিস ইংল্যান্ডের জমিদারী প্রথার আলোকে এদেশে অভিজাত জমিদার শ্রেণী তৈরি করতে চাইলেন প্রজার মঙ্গলের দিকে নজর না দিয়েই। এভাবেই ইংরেজরা এদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। এ ব্যবস্থার সুফলের চেয়ে কুফলই ছিল বেশি। এ ব্যবস্থার ফলে মুসলমানগণ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জরিপের মাধ্যমে না হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কম ধরা হয়েছিল। ফলে জমিদার ও সরকার উভয়েই লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সূর্যাস্ত আইনে অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদার সর্বশান্ত হয় আবার অনেক সংগতি সম্পন্ন মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, ব্যবসায়ী প্রমুখ জমিদার হয়ে যায়। এরাই কালক্রমে ইংরেজদের সাহায্য করে এবং রাজা মহারাজা ও নবাব উপাধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন করেন —

ক. লর্ড ক্লাইভ খ. লর্ড কর্ণওয়ালিস

গ. লর্ড ওয়েলেস্‌লি ঘ. লর্ড বেন্টিংক

২. বাংলায় ইংরেজ সমর্থক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয় —
   ক. একসালা বন্দোবস্তের ফলে খ. পাঁচসালা বন্দোবস্তের ফলে
   গ. দশসালা বন্দোবস্তের ফলে ঘ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে

৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হয় —
   ক. ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে

৪. লর্ড কর্ণওয়ালিস পুত্র ছিলেন —
   ক. জমিদার বংশের খ. রাজবংশের
   গ. সাধারণ বংশের ঘ. লর্ড বংশের

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়ণের কারণসমূহ লিখুন।
২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল কি ছিল।
৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল লিখুন।

পাঠ ৪

লর্ড ওয়েলেসলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি —

- লর্ড ওয়েলেসলির সমস্যাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য ও অধীনতামূলক নীতি কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সাম্রাজ্য বিস্তারে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- অধীনতামূলক নীতির ফলাফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ওয়েলেসলির সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়েলেসলির চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সমস্যাসমূহ

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসশি ভারত বর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকালকে উপমহাদেশের ইতিহাসে সংকটময় যুগ বলা যেতে পারে। জন শোরের উদার নিরপেক্ষনীতির ফলে শাসন ভার গ্রহণ করেই ওয়েলেসলি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন।

টিপু সুলতানের শক্তি সঞ্চয়

প্রথমত: ইংরেজদের চিরশত্রু মহীশূরের টিপু সুলতান তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ফ্রান্সের বিদ্রোহী জেকোবিন ক্লাবের সাথে এবং মরিশাসের ফরাসি শাসনকর্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। উপরন্তু তিনি ফরাসি সেনাপতি দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনাদের সাহায্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

নিযামের ইংরেজ বিরোধিতা

দ্বিতীয়ত: কোম্পানির শর্ত অনুযায়ী মারাঠাদের বিরুদ্ধে নিজামকে সাহায্য না করায় নিজাম ইংরেজদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফরাসি সেনাপতি রেমন্ডের নেতৃত্বে নিজ বাহিনীকে সুসজ্জিত করে তোলেন।

দৌলত রাওসিন্ধিয়ার বিরোধিতা

তৃতীয়ত: দৌলত রাও সিন্ধিয়া ফরাসি সেনাপতি পেরনের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন।

চতুর্থত: একমাত্র কুর্গ ছাড়া মালাবারের সকল রাজা ইংরেজ বিরোধী হয়ে উঠেন।

কাবুলের উপমহাদেশ আক্রমণের হুমকি

পঞ্চমত: কাবুলের জামান শাহের উপমহাদেশ বিজয়ের হুমকি ইংরেজদের ভয়ে ভীত করে তোলে।

নেপোলিয়নের উপমহাদেশ অভিযানের পরিকল্পনা

ষষ্ঠত: এ সময় ফরাসী-ইংরেজ শ্রুতার জের ধরে ফরাসি বীর নেপোলিয়ন উপমহাদেশ বিজয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন।

কোম্পানির আর্থিক সংকট

সপ্তমত: এ সময় কোম্পানির আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় পর্যায়ে নেমে যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্য যখন এমনিভাবে নানা সমস্যায় জর্জরিত ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে লর্ড ওয়েলেসলিকে শত্রু মোকাবিলায় অগ্রসর হতে হয়।

লর্ড ওয়েলেসলি

উদ্দেশ্য ও নীতি

লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক। প্রতিভাবান, বিদ্বান, আত্মর্যাদা সম্পন্ন ও অভিজাত সুলভ লর্ড ওয়েলেসলি চেয়েছিলেন উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তিকে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী করে তুলতে। এ ছাড়া এ উপমহাদেশ থেকে ফরাসি প্রভাব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে দূর করে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপন বিফল করাও তাঁর আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। এ সকল উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য স্বভাবত:ই সামাজ্যবাদী ওয়েলেস্‌লী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করেন।

মিত্রতা নীতি

লর্ড ওয়েলেসলি পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই এদেশবাসীর চাওয়া পাওয়াকে বিবেচনার যোগ্য মনে করেননি। পরস্পর বিবদমান এদেশীয় রাজাগণকে ইউরোপীয় সামরিক সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী ও উৎসাহী দেখে লর্ড ওয়েলেসলি তাঁদেরকে পুরোপুরি ইংরেজ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে চাইলেন। এ নীতি ওয়েলেসলির আগে ক্লাইভ এবং বিশেষ করে হেস্টিংস কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। তবে ওয়েলেসলি এ নীতিকে নিপুণতার সাথে ব্যাপকভাবে কার্যকর করেছিলেন। তাই তিনি স্যার জন শোরের নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে সামরিক অধীনতার ভিত্তিতে গঠিত এ নীতির নামকরণ করলেন 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

শর্তাবলী

লর্ড ওয়েলেসলির প্রবর্তিত এ নীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো :-

প্রথমত: যে সকল দেশীয় রাজা অধীনতা মূলক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হবেন, তাঁরা ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে কিংবা কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা চালাতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত: দেশীয় রাজাদের মধ্যে যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নিজ সেনাবাহিনী রাখতে পারবেন তবে তা একজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত: মিত্রতাবদ্ধ দেশীয় রাজ্যসমূহ হতে একমাত্র ইংরেজ ব্যতীত সকল ইউরোপীয় কর্মচারী ও নাগরিককে বিতাড়িত করতে হবে।

চর্তুথত: মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ যে কোন দেশ তাঁদের রাজ্যে একদল সৈন্য পালন করবেন এবং তাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নগদ অর্থ বা নিজ রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দেবেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দেশীয় রাজাদের নিরাপত্তার বিনিময়ে তাঁদের স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তার বির্সজনই এ নীতির মূল লক্ষ্য ছিল।

লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সূত্রে ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয় হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মারাঠা রাজ্য, তানেহার, সুরাট, কর্ণাট, অযোধ্যা প্রভৃতি রাষ্ট্র

প্রথমত: এ নীতি প্রয়োগের প্রথম শিকার হন হায়দ্রাবাদের দুর্বল নিজাম।

দ্বিতীয়ত: মহীশূরের বাঘ টিপু সুলতান এ নীতি গ্রহণ করতে রাজী না হলে কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

তৃতীয়ত: মারাঠা শক্তিকে যুদ্ধে পরাজিত করে মারাঠা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন।

চতুর্থত: ওয়েলেসলি ছোট ছোট রাজ্য যেমন তাঞ্জোর সুরাট ও কর্ণাটের উপর বল প্রয়োগ করে তাদের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য করেন। অযোধ্যার মত বড় রাজ্য ও এ নীতির আওতা হতে বাদ পড়েনি।

টিপু সুলতান

সংস্কার

কৃষিঃ লর্ড ওয়েলেসলি উপমহাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। বিশেষ করে মহীশূরের এবং মালাবারের যে অংশ ইংরেজ অধিকারে আসে সেখানে তিনি জমি জরিপ করার জন্য ডঃ ফ্রান্সিস বুকাননকে নিযুক্ত করেন। শুধু তাই নয় এদেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে গিয়েছেন যা থেকে পরবর্তীকালে ভারত সরকার কৃষি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হয়েছিল।

বিচার ব্যবস্থার নতুন নিয়ম প্রচলন

বিচার ব্যবস্থাঃ ১. কোর্ট ফি পুনরায় চালু করেন। ২. আপিল করার নিয়ম কানুন ও আগের চেয়ে কঠিন করা হয়। ৩. সহকারী জজের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। ৪. সদর দিউয়ানী আদালতের মামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের উপর থেকে বিচারের ভার সরিয়ে নিয়ে তিনজন ও পরে চারজন জজের উপর এ দায়িত্ব দিয়ে দেন।

জমিদারের ক্ষমতা

লর্ড ওয়েলেসলি রায়তদের উচ্ছেদ করবার ও তাদেরকে গ্রেফতার করবার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেন।

শিক্ষাঃ লর্ড ওয়েলেসলি এ উপমহাদেশে নতুন ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ তাঁর এ পরিকল্পনা অনুমোদন না করায় পরে তা ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কলেজে পরিণত হয়। তারই নির্দেশে কলকাতার বর্তমান গভর্নর ভবনটি নির্মিত হয়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠনে যে সকল গভর্নর জেনারেল অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

প্রথমত: কোম্পানির সংকটময় মুহূর্তে ওয়েলেসলি দায়িত্ব নিয়ে একে একে সকল সমস্যার সমাধান করে কোম্পানির সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান।

দ্বিতীয়ত: ওয়েলেসলি ভারতীয় রাজাদের মধ্যে সব চেয়ে স্বাধীনচেতা, ইংরেজের চিরশত্র টিপুকে পরাজিত ও নিহত করে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ শক্তিকে অপ্রতিহত করে তোলেন।

তৃতীয়ত: ওয়েলেসলি মারাঠা শক্তিকে ধ্বংস করে মারাঠাদের সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির উপর নির্ভরশীল করে তোলেন।

চতুর্থত: ওয়েলেসলি হায়দ্রাবাদ মহীশূর ও মারাঠা সংঘকে ধ্বংস করে দাক্ষিণাত্য হতে ফরাসি প্রভাব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করেন।

পঞ্চমত: তিনি মিশরের দিকে ফরাসি অগ্রগতিকে বন্ধ করার জন্য মিশরকে সামরিক সাহায্য দিয়ে এবং পারস্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতিকে বাধাদানের জন্য পারস্যে একটি মিশন প্রেরণ করে তাঁর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেন।

ষষ্ঠত: ওয়েলেসলি অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই বিচার, কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মনোবিবেশ করেছিলেন। এটা তাঁর কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজ। ফলে তাঁকে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়। তিনি এতই অহংকারী ছিলেন যে তা ঔদ্ধত্য বলে মনে হতো। তিনি অন্যের অসুবিধা ও কষ্টকে কিছু মনে না করে নিজের ইচ্ছাকেই চাপিয়ে দিতেন। ফলে এদেশীয় মানুষের দুঃখ দুর্দশা বেড়ে গিয়েছিল।

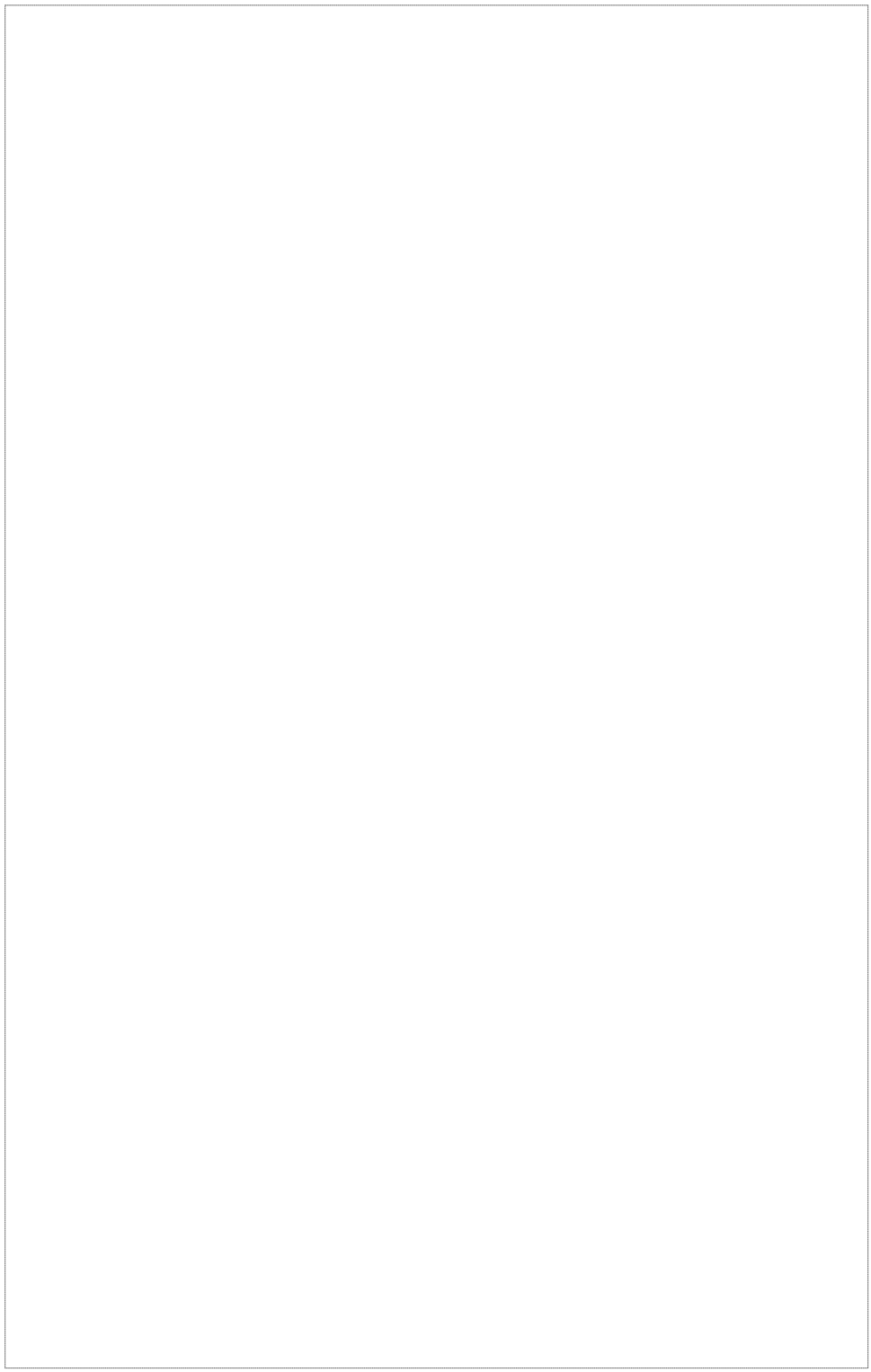

ওয়েলেসলির সময় ইংরেজ রাজ্য

সার-সংক্ষেপ

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। যে কোন উপায়ে হোক, ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য ব্যাকুল এ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এদেশের দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে পেরেছিলেন। আর এ সুযোগ নিয়েই লর্ড ওয়েলেসলি সামরিক অধীনতার ভিত্তিতে এক নীতি প্রবর্তন করেন যা ইতিহাসে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি নামে খ্যাত। তিনি নিজাম ও মারাঠাদের অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করেন। অন্যায়ভাবে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। গৃহবিবাদের সুযোগে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশ অধীনে নিয়ে আসেন। এভাবে লর্ড ওয়েলেসলি ছলে বলে কৌশলে উপমহাদেশের প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মহীশূর, নিজাম ও মারাঠাদের পতন ঘটিয়ে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এদেশের জনগণের স্বার্থ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে —
   ক. ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে

২. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন —
   ক. লর্ড কর্ণওয়ালিস খ. লর্ড ওয়েলেসলি
   গ. লর্ড ডালহৌসী ঘ. লর্ড কার্জন

৩. উপমহাদেশে যে গভর্নর জেনারেল সাম্রাজ্যবাদী বলে পরিচিত, তার নাম —
   ক. লর্ড অকল্যাণ্ড খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ
   গ. লর্ড ওয়েলেসলি ঘ. লর্ড হেস্টিংস

৪. মহীশূরের বাঘ বলা হয় —
   ক. হায়দর আলীকে খ. টিপু সুলতান কে
   গ. নিজামকে ঘ. আসিফউদ্দৌলা কে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. লর্ড ওয়েলেসলি ক্ষমতায় এসে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন?
২. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি সম্পর্কে ধারণা দিন।
৩. লর্ড ওয়েলেসলির চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ ৫

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক : ১৮০৩-১৮৭০ খ্রিঃ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি —

- বেন্টিঙ্কের অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের বৈদেশিক নীতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের চরিত্র ও কৃতিত্বের বিষয় আলোচনা করতে পারবেন।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রথম জীবনে মাদ্রাজ কাউন্সিলের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে এই উপমহাদেশে আগমন করেন। এ সময়ে ভেলোরে যে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা দমনে তিনি ব্যর্থ হলে ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেন। অতঃপর লর্ড আমহার্স্ট স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে গেলে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ পুনরায় বেন্টিঙ্ককে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করে এদেশে পাঠানো হয় এবং তিনি ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন। তিনি একজন শান্তিপ্রিয় উদারপন্থী শাসক ছিলেন। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে শাসিতদের কল্যাণ সাধান করাই শাসকের প্রধান কর্তব্য। তাই তাঁর শাসনামল উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে।

বেন্টিংক

অর্থনৈতিক সংস্কার

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর কোম্পানির অর্থনৈতিক সমস্যা যখন চরম আকার ধারণ করে ঠিক সেই সময় শাসনভার গ্রহণ করে বেন্টিঙ্ক আর্থিক সমস্যা সমাধানে মনোযোগ দেন। তাই তিনি প্রথম অবস্থাতে ব্যয় সংকোচ ও রাজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করেন। বোর্ড অব ডাইরেক্টরের নির্দেশ পেয়ে তিনি সামরিক ও বেসামরিক ব্যায় কমানোর লক্ষ্যে কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করেন।

ব্যয় সংকোচ ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা

শান্তিকালীন সময়ে সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের অর্ধেক ভাতা দেয়ার যে নিয়ম চালু ছিল তা তিনি তুলে দেন। তিনি উর্ধতন বেসামরিক কর্মকর্তাদের বেতন কমিয়ে দেন। তিনি কোম্পানির অতিরিক্ত কর্মচারীদেরও ছাঁটাই করেন। এমন কি তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের দক্ষতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে উর্ধতন অফিসারদের নিকট হতে গোপন সংবাদ নেয়ারও ব্যবস্থা চালু করেন।

কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য লর্ড বেন্টিক মালবে উৎপন্ন আফিমের উপর কর ধার্য করেন। যে সব জমি অবৈধভাবে নিষ্কর বলে দেখান হয়েছিল, সেগুলোর উপর তিনি কর বসান। মাদ্রাজ ও আগ্রায় রায়তওয়ারী প্রথার প্রবর্তন করে তিনি কোম্পানির আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি সিন্ধুর আমীর ও পাঞ্জাবের রনজিত সিংহের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন

করেন। এ সকল ব্যবস্থা নেয়ার ফলে কোম্পানির যে ঘাটতি ছিল তা পূরণের পর উদ্বৃত্ত হয় এবং কোম্পানির আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে।

শাসন সংস্কার

শাসন সংক্রান্ত সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে প্রথমেই তিনি বিচার বিভাগের উন্নতি সাধন করেন। বেন্টিঙ্কই সর্বপ্রথমে এদেশীয়দের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তিনি কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত প্রাদেশিক বিচারালয় গুলো তুলে দিয়ে জেলা কালেক্টরের উপর ফৌজদারী মামলার বিচার করার দায়িত্ব দেন। তিনি কয়েকটি জেলাকে একত্রিত করে একটি বিভাগ গঠন করে প্রতিটি বিভাগে একজন করে কমিশনার নিযুক্ত করেন। ডেপুটি এবং জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদও সৃষ্টি করা হয়। সদর আমিনের পদেও এদেশীয়দের নিয়োগ করা হয়।

বিচার ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে এদেশীয়দের নিয়োগ

এদেশীয় বিচারক এবং কর্মচারীদের বেতন স্কেল ও পদে মর্যাদা বাড়ানো হয়। প্রশাসনিক সুবিধার্থে তিনি বোর্ড অব রেভিনিউ এর সদর দপ্তর কলকাতা থেকে এলাহাবাদে সরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি এদেশীয় বিচারালয়গুলোতে মুসলিম আমল থেকে প্রচলিত ফার্সি ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার প্রচলন শুরু করেন। তিনি বাংলায় সর্বপ্রথম 'জুরী ব্যবস্থার' প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে এদেশীয়দের জুরীর সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁর আরও একটি সংস্কার ছিল এদেশের ফৌজদারী আইন বিধির সংকলন। বহুকাল ধরে প্রচরিত মুসলিম আইন ও গভর্নর জেনারেলদের ঘোষিত আইন দ্বারা ফৌজদারী মামলা চালানো হতো। বেন্টিঙ্ক লর্ড মেকলের সহায়তায় আইন কমিশন গঠন করে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' তৈরি করেন যা ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গাইড বুক হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এভাবে বেন্টিঙ্ক সুশৃঙ্খল ও দক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

বিচার ও শাসনকার্যে ফার্সী ভাষার পরিবর্তন

সামাজিক সংস্কার

সমাজ সংস্কারের জন্য বেন্টিঙ্কের নাম এ উপমহাদেশের ইতিহাসে চির স্মরণীয়। সতীদাহ নিবারণ ও ঠগী দমন হলো বেন্টিঙ্কের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেন। বহু প্রাচীন কাল থেকে এদেশের হিন্দু সমাজে 'সহমরণ' (মৃত স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করা) এবং 'অনুমরণ' (বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাকে একাকী চিতায় পুড়িয়ে মারা) প্রথার প্রচলন ছিল। এভাবে স্ত্রীগণ সতী হতেন। কোন কোন মুসলমান স্ত্রীও সতী হয়েছেন এমন প্রমাণও রয়েছে। অনেক সময় সামাজিকতা রক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন বিধবাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোরপূর্বক চিতায় পুড়িয়ে মারতো। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও তাঁর পরের অনেক গভর্নর জেনারেলই এ অমানবিক প্রথাকে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশীয় ভাবাদর্শে আঘাত লাগতে পারে বলে তাঁরা ততটা জোর দেননি। লর্ড বেন্টিঙ্ক কয়েকজন এদেশীয় উদারপন্থী সংস্কারক বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করেন। সদর নিজামত আদালতের জজদের সমর্থন নিয়ে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এক আদেশ বলে এই অমানবিক প্রথা রহিত করেন। এ ছাড়া তৎকালীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী দেবতাকে খুশী করার জন্য নিজের প্রথম সন্তানকে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ ও বিবাহ দেয়ার অক্ষমতা হেতু নিজ শিশু কন্যাকে গলাটিপে হত্যা করার নিয়মও বেন্টিঙ্ক চিরতরে বন্ধ করে দেন।

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ

ঠগীদের কথা বহু আগে থেকে জানা যায়। ঠগীরা ছদ্মবেশে হঠাৎ করে এসে নিরীহ পথিকদের, তীর্থযাত্রীদের ও ভ্রমণকারীদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে তাদের সব কিছু লুঠ করে নিয়ে

ঠগী দমন

যেতো। এটা ছিল ঠগীদের পেশা। কথিত আছে যে মুগল সম্রাট আকবর এটোয়া জেলাতে প্রায় পাঁচশো ঠগীকে হত্যা করেন। বিদেশী ভ্রমণকারীদের কাছ থেকেও জানা যায় যে মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়েও ঠগীদের বেশ উৎপাত ছিল। সম্ভবত ইংরেজ আমলে এদের দৌরাত্ম বেড়ে গিয়েছিল। ঠগীরা ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ডাকাতদল। এদলে হিন্দু-মুসলিম উভয় গোত্রের লোক ছিল। এরা পুরোহিত, দরবেশ ইত্যাদি ছদ্মবেশে ডাকাতি করতো। হায়দ্রাবাদ থেকে অযোধ্যা, রাজপুতানা ও বুন্দেলখন্ডে ঠগীদের আস্তানা ছিল। তারা সাংকেতিক ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতো। তাই জনগণের নিরাপত্তার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ণেল পীমানের উপর ঠগী দমনের ভার দেন। কর্নেল পীমান ঠগীদের ভাষা আয়ত্ব করে এবং ফেরিঘিয়া নামে একজন ঠগীর কাছে থেকে ঠগীদের কৌশল ও গোপন আস্তানা গুলোর খবর জেনে নিয়ে প্রায় পনেরশ ঠগীকে ধরে ফেলেন এবং তাদের কঠোর শাস্তি দেন (১৮৩০ খ্রিঃ)।

শিক্ষা সংস্কার

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বহু আগে থেকে উপমহাদেশে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা প্রচলিত ছিল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট দ্বারা কোম্পানি এদেশীয়দের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৎসরে একলক্ষ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য ছিল। এ অর্থ কেবল সংস্কৃত, ফারসি প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় হতো। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বেন্টিঙ্ক ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের উদ্যোগ এখানে দুটি মত বা দলের সৃষ্টি হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন

একদল প্রাচ্য ভাষা (সংস্কৃত ও ফারসি) শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদল, পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের (ইংরেজি) শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। শেষোক্ত দলের সমর্থক ছিলেন গভর্নর জেনারেল পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য লর্ড মেকলে এবং এদেশীয় সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়। লর্ড মেকলে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে একটি স্মারকলিপি গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের কাছে পেশ করেন। এ বিষয়ে আন্দোলন হলেও বেন্টিঙ্ক এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেন এবং ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা রূপে ঘোষণা করেন। ঐ বৎসরই (১৮৩৫ খ্রিঃ) বেন্টিঙ্কের চেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় একটি মেডিক্যাল কলেজ ও বোম্বাইয়ে (বর্তমান মুম্বাই) এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য তিনি ইতিহাসে আজও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন।

ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষা

অন্যান্য

সমাজ জীবনের উন্নয়ন

এ ছাড়া বেন্টিঙ্ক এদেশের ভেতরে মালামাল চলাচলের উপর শুল্ক উঠিয়ে দেন। নদী ও সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলে উৎসাহ দেন। চা ও কফি উৎপাদনের জন্য চা-বাগান স্থাপনে উৎসাহ দেন। তিনি জল সেচ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেন। এদেশীয় সেনাবাহিনীতে বেত্রাঘাত করে শাস্তি প্রদানের যে নিয়ম ছিল তা তিনি বন্ধ করে দেন। উপমহাদেশের কোন

কোন স্থানে নরবলির যে নিয়ম ছিল তাও তিনি বন্ধ করে দেন। বেন্টিঙ্কের এ সকল সংস্কারের ফলে সমাজ জীবন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়েছিল।

বৈদেশিক নীতি

নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের চেষ্টা

বৈদেশিক নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলার পক্ষপাতি ছিলেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাঁর নিরপেক্ষ নীতির সুযোগ নিয়ে বরোদার গাইকোয়াড় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করে। ভূপাল, গোয়ালিয়র ও জয়পুরে গোলযোগ শুরু হলে বেন্টিঙ্ক এ সকল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন। কাছাড়ের রাজা উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে সে রাজ্যের জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী বেন্টিঙ্ক তা কোম্পানির শাসনে নিয়ে আসেন। কুর্গের (মহাশূরের কাছে) রাজার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে তিনি কুর্গও অধিকার করেন। আসামের জৈন্তিয়া পরগনার জনগণ কয়েকজন ইংরেজকে নরবলি দিতে ধরে নিয়ে যায়। কোম্পানির অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের ছেড়ে না দেয়ায় বেন্টিঙ্ক বাধ্য হয়ে জৈন্তিয়া পরগণা নিজ শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। কুশাসন ও অরাজকতার অভিযোগে মহীশূর রাজ্যেও তিনি অস্থায়ী ভাবে ইংরেজ শাসন প্রবর্তন করেন।

উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে রাশিয়ার অশুভ প্রভাব বন্ধ করার জন্য তিনি পাঞ্জাবের রণজিত সিংহের সাথে চিরস্থায়ী মিত্রতা এবং সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ইংরেজ স্বার্থ রক্ষা করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

জনহিতৈষী ও জন কল্যাণকামী শাসক

উপমহাদেশে ব্রিটিশ যুগের ইতহাসে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। সামরিক প্রতিভার অভাব বেন্টিঙ্কের চরিত্রে থাকলেও দয়াপ্রবণতা বিচক্ষণতা আনুগত্য ও জনকল্যাণের ইচ্ছা প্রভৃতি গুণাবলীর বিচিত্র সমাবেশ তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। লর্ড মেকলে বেন্টিঙ্ককে জনহিতৈষী ও জনকল্যাণকামী শাসক বলেছেন। এদেশীয় সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ, এদেশীয় ও ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, এদেশীয়দের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি সাধন প্রভৃতির জন্য লর্ড মেকলে বেন্টিঙ্কের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচ্য দেশীয় অত্যাচারী শাসনের স্থলে ব্রিটিশ স্বাধীনতার স্বাদ এদেশবাসীকে দিয়েছিলেন। একদিকে ইংরেজ স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি যেমন রণজিত সিংহ এবং সিন্ধুর আমীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, অন্যদিকে তেমনি মহীশূর, কাছাড়, কুর্গ, জৈন্তিয়া রাজ্য দখল করতে কুণ্ঠিত হননি। তবুও সব দিক থেকে বিচার করলে উপমহাদেশে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে বেন্টিঙ্কের নাম কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক এদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। প্রথম জীবনে তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ওয়াটারলুর যুদ্ধ বিজেতা ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সেনা বাহিনীতে ছিলেন। তিনি যখন এদেশে গভর্নর জেনারেল হিসেবে আসেন তখন তাঁর এদেশে সামরিক নৈপুণ্য দেখানোর কোন সুযোগ ছিল না। কারণ সে সময়টা ছিল সংস্কারের যুগ। তাই নি:সন্দেহে বলা যায যে, বেন্টিঙ্কই প্রথম গভর্নর জেনারেল যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশে প্রজাদের কল্যাণ সাধনই শাসকের প্রধান কর্তব্য। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অবাধ প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়। বেন্টিঙ্কের সমাজ সংস্কার ধর্মীয় গোঁড়ামী ও নিপীড়নের হাত থেকে এদশের জনগণকে রক্ষা করেছিল। তাঁর শিক্ষা সংস্কার পরবর্তীকালে এদেশীয়দের মনোজগতে এক বিরাট আলোড়ন ও পরিবর্তন নিয়ে আসে যা এদেশের সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। তাই আজও লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক উপমাহদেশের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. বিচার ও শাসন বিভাগের উচ্চপদে এদেশীদের নিয়োগ করেছিলেন —
   ক. লর্ড হেস্টিংস খ. লর্ড বেন্টিঙ্ক
   গ. লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ. লর্ড অকল্যান্ড

২. উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা এদেশে চালু হয় —
   ক. ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে

৩. সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয় —
   ক. ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে

৪. ঠগীদের দমন করেছিলেন —
   ক. কর্নেল পীমান খ. কর্নেল আপটন
   গ. কর্নেল চ্যাম্পিয়ন ঘ. কর্নেল ব্রেইথওয়েট

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. লর্ড বেন্টিংকের অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. বেন্টিংকের প্রশাসনিক সংস্কারের পরিচয় দিন।
৩. বেন্টিংক সামাজিক ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার করেছিলেন।

পাঠ ৬

লর্ড ডালহৌসী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি —

- লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যগুলো কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতি কি ও এ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- লর্ড ডালহৌসীর শাসন সংস্কার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের পর মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে লর্ড ডালহৌসী এ উপমহাদেশে আসেন। আসার পূর্বে তিনি বোর্ড অফ ট্রেডের সভাপতি হিসেবে ব্রিটিশ মন্ত্রী সভায় ছিলেন। ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত যত সাম্রাজ্যবাদী শাসক এ উপমহাদেশে প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদ নীতির তিনটি লক্ষ্য ছিল-

ক. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শাসনের প্রসার
খ. ইংরেজ সাম্রাজ্যের সংহতি স্থাপন ও
গ. উপমহাদেশে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টি

এ উদ্দেশ্য সমূহ হাসিলের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তা এদেশের জনগণের জন্য কতটা কল্যাণমুখী ছিল, এ সব চিন্তা তাঁর কাছে গৌণ ছিল। ডালহৌসী বৃটিশ রাষ্ট্র বিস্তারে যে নীতিগুলো গ্রহণ করেছিলেন তার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক ছিলো- ১. প্রত্যক্ষ যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয় ২. স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা রাজ্য জয় ৩. কুশাসন ও অরাজকতার অজুহাতে পররাজ্য দখল। এর মধ্যে তিনি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করেই সবচেয়ে বেশি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

লর্ড ডালহৌসী

ডালহৌসীর রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা

যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয়

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮ - ৪৯ খ্রি:)ঃ লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ের প্রথম শিখ যুদ্ধের পরাজয় শিখ জাতি ভুলতে পারেনি। এছাড়া হার্ডিঞ্জের কিছু পদক্ষেপ শিখদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। পাঞ্জাবে নিযুক্ত কোম্পানি কর্মচারীদের অশোভন আচরণ, শিখ গুরুদুয়ারাগুলোর প্রতি অসম্মান দেখানো, শিখ রমনীদের নির্যাতন, শিখদের ধর্মবিশ্বাস ও সম্মানে আঘাত দেয়। ইংরেজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাণী ঝিন্দদের প্রতিবাদ শিখদের আলোড়িত করে।

দেওয়ান মূলরাজ ছিলেন পাঞ্জারের শাসনকর্তা। লাহোরের ইংরেজ রেসিডেন্ট মূলরাজকে হিসাবপত্র দাখিল করতে বলায় মূলরাজ পদত্যাগের ভান করেন। দুজন ইংরেজ কর্মচারীসহ নবনিযুক্ত শাসকর্তাকে কর্মস্থলে পাঠানো হলে মূলরাজ তাদের হত্যা করে পুনরায় পাঞ্জাবে প্রভুত্ত স্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের অন্যত্র শিখ যোদ্ধারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করে। শের সিংহের নেতৃত্বে কতিপয় শিখ যোদ্ধা ইংরেজদের পক্ষে গেলেও পরে মূলরাজের পক্ষে চলে আসে।

পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের আশায় আফগান জাতিও এই শিখ বিদ্রোহে যোগ দেয়। বাধ্য হয়ে লর্ড ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গাফ ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে শিখ সেনাপতি শেরসিংহের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। কিন্তু চিনাব নদীর নিকটে গুজরাটের যুদ্ধে শিখ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ডালহৌসী ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষের মতামতের অপেক্ষা না করে পাঞ্জাব অধিকার করে নিলেন। ফলে উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্মযুদ্ধ

লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকালে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদের ফলে দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর হতেই বর্মীগণ ইংরেজদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং ক্রমে তাদের সম্পর্কের এমনি অবনতি ঘটে যে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজ ইংরেজ রেসিডেন্টকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগের আদেশ দেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মীদের হাতে অপমানিত হয়েছে সংবাদ পেয়ে ডালহৌসী তখনই ব্রহ্মরাজের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে পাঠান। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ডালহৌসী নৌ-সেনাপতি কমোডর ল্যাম্বটিকে রণতরী সহ ব্রহ্মদেশে পাঠান। ব্রহ্মরাজ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না বিধায় ডালহৌসীর সমর্থন আদায়ের জন্য দুর্ব্যবহারের দায়ে রেঙ্গুনের গভর্নরকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু নৌ-সেনাপতি ল্যাম্বার্টি এতে খুশী না হয়ে ব্রহ্মরাজের একটি রণতরী দখল করে নেয়। ফলে বর্মীগণ ল্যাম্বার্টির জাহাজে গোলাবর্ষণ শুরু করলে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

বার্মার উপকূলীয় অঞ্চল অধিকার

ডালহৌসী ল্যাম্বাটিকে সাহায্যের জন্য জেনারেল গডউইনকে প্রেরণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই রেঙ্গুন প্রোম ও পেগু অধিকৃত হল। ব্রহ্মরাজ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে ডালহৌসী সমগ্র পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এভাবে ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমগ্র উপকূল অঞ্চল যেমন ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হল তেমনি ব্রহ্মদেশ সমুদ্রের সাথে সংযোগ পথের জন্য ব্রিটিশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এছাড়া ডালহৌসী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে সিকিম রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

স্বত্ব বিলোপ নীতির সংজ্ঞা এবং স্বত্ব বিলোপ নীতি

স্বত্ববিলোপ নীতির সংজ্ঞা: প্রাচীন হিন্দু রীতির উচ্ছেদ ঘটিয়ে বৃটিশ শক্তির উপর নির্ভরশীল দেশীয় রাজ্যগুলো কুক্ষিগত করার জন্য যে নতুন নীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল তাই স্বত্ব বিলোপ নীতি নামে পরিচিত। এ নীতির অর্থ হলো এই যে, ইংরেজ আশ্রিত ও অনুগৃহীত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে; কোন পালিত পুত্রের অধিকার স্বীকার করা হবে না। প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী অপুত্রক রাজা রাজবংশ ও রাজ্য রক্ষা করার জন্য পুত্র পালক নিতে পারতেন। আগে এ ধরণের ক্ষেত্রে ইংরেজের কাছে থেকে রাজারা বিশেষ অনুমতি নিয়ে দত্তক গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু ডালহৌসী কঠোরতার সাথে আগের রীতি বন্ধ করে দিয়ে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের পথ আরও প্রশস্ত করে তোলেন।

স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ

যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়াও লর্ড ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্য প্রসারে উদ্যোগ নেন। মনে প্রাণে সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী সর্বপ্রথম সাঁতারা রাজ্যের উপর তার স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ করেন। সাঁতারার রাজা ইংরেজের বিনা অনুমতিতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছিলেন। ফলে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা মারা গেলে ডালহৌসী দত্তক পুত্রের দাবি অগ্রাহ্য করে সাঁতারা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এরপর সম্বলপুর রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ডালহৌসী সম্বলপুর রাজ্যটিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন (১৮৫০ খ্রিঃ)।

সাঁতারা, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য অধিকার

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভোঁসলে বংশের শেষ রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ডালহৌসী নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। কারণ নাগপুর ইংরেজের প্রত্যক্ষ অধিকারে আসায় কোন দেশীয় রাজ্যের এলাকায় না ঢুকে কলকাতা থেকে বোম্বাই (মুম্বাই) যাতায়াতের পথ ইংরেজদের জন্য সোজা হয়ে গেল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঝাঁসির রাজা মারা গেলে তাঁর দত্তক পুত্রের দাবি অস্বীকার করে ডালহৌসী ঝাঁসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ঐ ভাবে শতদ্রু নদীর নিকট ভগৎ রাজ্য, মধ্যপ্রদেশে উদয়পুর, রাজস্থানে করৌলি প্রভৃতি রাজ্যগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত হয়।

নাগপুর, ঝাঁসি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত

ইংরেজ প্রদত্ত ভাতা ও খেতাবের স্বত্ব লোপঃ অতঃপর ডালহৌসী ইংরেজ প্রদত্ত দেশীয়দের ভাতা ও খেতাবের ক্ষেত্রেও স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও মারা গেলে ডালহৌসী বাজীরাও এর দত্তকপুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেন। একই ভাবে তাঞ্জোরের রাজা মারা গেলে তাঁর দু'কন্যা সন্তান থাকলেও তাঁদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সে সঙ্গে তাঞ্জোরের রাজপদ ও ভাতা বন্ধ করা হয়। ডালহৌসী মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদূর শাহের খেতাব ও ভাতা লোপ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিচালক সভা বাধা দেয়ার ফলে তিনি সফল হননি।

কুশাসনের অজুহাত: এরপর লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নবাবের হাতে থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হাতে। ফলে রাজ্য শাসনে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই তাঁকে অযোধ্যা ছেড়ে কলকাতার খিদিরপুরে বার লক্ষ টাকা নিয়ে বাস করতে বাধ্য করা হয়। ঠিক কুশাসনের কারণে না হলেও হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজ সেনাবহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য যে অর্থ দিতেন তা বাকী পড়ায় ডালহৌসী নিজামের নিকট হতে বেরার প্রদেশটি কেড়ে নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

স্বত্ত্ববিলোপ নীতির ফলাফল

ডালহৌসীর পূর্ববর্তী শাসকগণের নীতি ছিল যেখানে পারতপক্ষে ইংরেজ শাসন সম্প্রসারণ না করা, সেখানে ডালহৌসীর নীতি ছিল যতদূর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যায় ততদূর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে এদেশীয় নবাব-রাজা ও জমিদার এবং প্রজার মনে ভীতি ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিলেন। কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের রাজ্যের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এ নীতি প্রয়োগের দ্বারা তিনি বিভিন্ন অজুহাতে একের পর এক রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ছলে বলে কৌশলে না হলে তিনি যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য দখল করতেন। উপরন্তু, ডালহৌসী এ নীতি প্রয়োগের সময় এদেশের প্রচলিত রীতি নীতি ও ধর্মীয় মনোভাব এবং জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন।

ডালহৌসীর রাজ্য গ্রাস সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল

এ ধূমায়িত ইংরেজ বিরোধী অসন্তোষই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল।

সংস্কার

লর্ড ডালহৌসী শুধু একজন সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না রবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। ডালহৌসীর কর্মশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রশাসনিক ক্ষেত্রের প্রত্যেক বিভাগেই তিনি সংস্কার সাধন করেন।

শাসন সংস্কার: তিনি গভর্নর জেনারেলের কাজের চাপ কমানোর লক্ষ্যে বাংলার জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর (ছোট লাট) নিযুক্ত করেন। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে বিভিন্ন জেলায় ভাগ করা হয়। ফলে রাজ কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেড়ে যায়। তিনি বার্ষিক সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং বে-সামরিক কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার স্বাধীনতা রক্ষায় চেষ্টা করেন। তৎকালীন বাংলার সেনাদের সামরিক যোগ্যতার অভাব লক্ষ করে তিনি প্রত্যেক সুস্থ সবল লোকের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে ভবিষ্যতে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারে। সবশেষে তিনি বন্দীদিগকে ইন্‌সপেকটরদের অধীনে রাখার একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

সামাজিক সংস্কার: সমাজ সংস্কারক হিসেবে ডালহৌসী অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। ডালহৌসী আট বছরের মধ্যে বহু সংস্কার প্রবর্তন করে আধুনিক যুগের সূচনা করেন। যেমন: তিনি বিধবা বিবাহ আইন পাস করে হিন্দু বিধবা বিয়েকে আইন সঙ্গত করেন। এ বিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডালহৌসীকে সাহায্য করেন। ডালহৌসী এমন একটি আইন পাস করান যাতে এদেশীয়গণ ধর্মান্তরিত হলেও তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করতে পারে।

জনহিতকর কাজ

ডালহৌসীর শাসনকাল বিভিন্ন জনহিতকর কার্যের জন্য বিখ্যাত। তিনি পূর্তবিভাগের প্রতিষ্ঠিত গঙ্গা খাল খনন ও জল সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তিনি রাজপথ ও সড়কগুলোর উন্নয়ন করেন। তাঁরই সময়ে কলকাতা হতে পেশোয়ার পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড স্থাপিত হয়।

রেললাইন স্থাপন

এদেশীয় রেলপথ ব্যবস্থার জনক ছিলেন ডালহৌসী। তাঁর সময়ে বোম্বাই হতে টানা পর্যন্ত রেললাইন চালু হয় (১৮৫৩ খ্রি:)।

ডালহৌসি ডাক বিভাগের সংস্কার, কলকাতা হতে আগ্রা পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ও পেনী পোস্টকার্ড ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি বনভুমি সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করেন এবং চা ও কফি বাগানের প্রসার সাধন করেন। তাঁর আমলে মেরিয়া নামক এক সমাজ বিরোধী দল বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। তিনি এই মেরিয়া উপদ্রপের অবসান ঘটান।

শিক্ষা সংস্কারঃ ডালহৌসী এদেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষার উন্নয়নে মনোযোগ দেন। এ সময় বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড একটি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করেন যা উডের ডেসপ্যাচ নামে বিখ্যাত। এই ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি গঠনে সাহায্য করে। এ পরিকল্পনা অনুসারে ডালহৌসী 'শিক্ষা বিভাগ' সৃষ্টি করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রান্ট-ইন-এইড দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। উডের ডেসপ্যাচে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি ইউনিভারসিটি স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

ডালহৌসী নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন এবং তাঁর ও কাউন্সিল সদস্য বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় বেথুন কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার কথাও ভাবেন। তিনি রুরকির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও স্থাপন করেন। এ সকল উন্নতি সাধন করে ডালহৌসী এদেশে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করেন।

সার-সংক্ষেপ

একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে ডালহৌসীর উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয় প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধন করা। সে কারণে তিনি মনে করতেন যে দেশীয় শাসন অপেক্ষা ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত ও মঙ্গলজনক। ফলে এ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বশত তিনি ছলে বলে কৌশলে দেশীয় রাজ্য দখলের নীতি গ্রহণ করেন। এভাবে স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সাতারা সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, উদয়পুর, জৈন্তাপুর ও ভগৎপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সিন্ধু নদ হতে ব্রহ্মদেশের ইরাবতীর তীর পর্যন্ত ডালহৌসী ব্রিটিশ পতাকা উড়িয়ে দেন।

অবশ্য অভ্যন্তরীণ সংস্কারেও তাঁর অবদান কম নয়। আট বছরের মধ্যে তিনি বহু সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক যুগের সূচনা করেন। তিনি রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও পূর্তবিভাগ ও জনশিক্ষা ব্যবস্থার জনক ছিলেন। তিনি যোগাযোগ, বিধবা বিবাহ প্রথা, জলসেচ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনন্য। তাঁর সময়ে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন নারী শিক্ষার অগ্রদূত। তাই শাসক ও সংস্কারক হিসাবে ডালহৌসী অবশ্যই প্রশংসা পেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. লর্ড ডালহৌসী ছিলেন —
   ক. দক্ষ প্রশাসক খ. সমাজ সংস্কারক
   গ. গণতন্ত্রমনা ঘ. সাম্রাজ্যবাদী

২. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন —
   ক. লর্ড ওয়েলেস্‌লী খ. লর্ড কর্ণওয়ালিস
   গ. লর্ড ডালহৌসী ঘ. লর্ড হেস্টিংস

৩. সমগ্র উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারিত হয় —
   ক. লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে খ. লর্ড ডালহৌসীর সময়ে
   গ. লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে ঘ. লর্ড অকল্যান্ডের সময়ে

৪. এদেশে রেল ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তন করেন —
   ক. লর্ড ডালহৌসী খ. লর্ড হেস্টিংস
   গ. লর্ড ওয়েলেসলি ঘ. লর্ড হার্ডিঞ্জ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. স্বত্ববিলোপ নীতি কি? বর্ণনা করুন।
২. স্বত্ববিলোপনীতির ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে লর্ড ডালহৌসির অবদান লিখুন।

পাঠ ৭

কোম্পানি আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য ভাষা ও শিক্ষার প্রচলন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি—

- কোম্পানি আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- কোম্পানি আমলের পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা ও এর প্রচলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কোম্পানি আমলের শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শাসন ব্যবস্থা

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে। কিন্তু ধীরে ধীরে বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হয়। এক এক জায়গায় এক এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটেছে। তাই সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের দায়িত্বও এসে পড়ে। বস্তুত কোম্পানিকে যখন এদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তখন তাকে নানা সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এদেশীয় ব্যবস্থা, প্রথা, ভাষা, নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা, যাতায়াত ও যোগাযোগের অসুবিধার মধ্য দিয়ে কোম্পানি একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। যেহেতু বাংলায় ইংরেজরা প্রথম রাজ্য বিস্তার করেছিল, সেহেতু বাংলার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানেও তাদের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল।

ক্লাইভের শাসন ব্যবস্থা

দ্বৈত শাসন

দীউয়ানী লাভের পর ক্লাইভ এদেশ শাসনের জন্য যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির হাতে ছিল 'রাজস্ব-আদায়' ও 'দেশ রক্ষার ভার' আর নবাবের হাতে ছিল বিচার ও শাসনের ভার। এভাবে ধীরে ধীরে এদেশে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার পথ সুগম হতে থাকে। ক্লাইভই ছিলেন ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

হেস্টিংসের যুগে শাসন ব্যবস্থা

রেভিনিউ বোর্ড গঠন

অতঃপর হেস্টিংস এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। নানা বাধা ও বিপত্তির মধ্যেও হেস্টিংস শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। প্রথমেই হেস্টিংস, ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ করেন। তিনি শাসন ও রাজস্ব বিভাগ কোম্পানির অধীনে নিয়ে আসেন। গভর্নর ও কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে তিনি একটি 'বোর্ড অব রেভিনিউ' গঠন করে তার উপর রাজস্ব ব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব দেন। তিনি ইংরেজ 'সুপার ভাইজরদের' স্থলে 'কালেকটর' নিয়োগ করেন। পূর্বে যেখানে উচ্চপদে শুধুমাত্র ইংরেজদের নিয়োগ করা হতো, এখন সেখানে এদেশীয়দের নিয়োগ করা হলো। দুর্নীতি বন্ধের জন্য তিনি কোম্পানির কর্মচারিদের মোটা বেতনের ব্যবস্থা করেন।। রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য হেস্টিংস পাঁচ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ মূল্যে জমিদারি ইজারা দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন যা 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। পাঁচসালা বন্দোবস্তের ভুলত্রুটি লক্ষ করে হেস্টিংস জমিদারদের সঙ্গে একটা স্বল্প মেয়াদী বন্দোবস্ত করেন যা 'একসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত।

অতঃপর হেস্টিংস বাণিজ্য ক্ষেত্রে দস্তক প্রথা তুলে দেন এবং সে সঙ্গে কোম্পানির কর্মচারিদের বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসাও বন্ধ করে দেন। দেশের অভ্যন্তরে মালামাল চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি শুল্ক চৌকিগুলো বিলুপ্ত করে দেন। কোম্পানির স্বার্থে কাপড় তৈরির জন্য তাঁতীদের উপর অত্যাচার করা নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দূত প্রেরণ করেন।

ফৌজদারী ও দিওয়ানী আদালত স্থাপন

হেস্টিংস মুগল বিচার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। তিনি কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করেন যাতে কোম্পানি প্রশাসন কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। হেস্টিংস বিচার বিভাগকে রাজস্ব বিভাগ হতে পৃথক করে প্রতি জেলায় একটি করে ফৌজদারী ও দিওয়ানী আদালত স্থাপন করেন। তিনি এদেশীয় কাজী বা মুফতীর দ্বারা বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন। হেস্টিংসই সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা মোকদ্দমা হিন্দু মুসলিম ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিচারের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। এদেশীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি কলকাতায় মাদ্রাসা, বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন।

কর্ণওয়ালিসের সময়ে শাসন ব্যবস্থা

হেস্টিংসের পদত্যাগের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর উপর দায়িত্ব পড়ে হেস্টিংসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার। তাই লর্ড কর্ণওয়ালিস একটি দক্ষ প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা তৈরিতে মনোযোগ দেন।

সিভিল সার্ভিস গঠন

প্রথমেই কর্ণওয়ালিস প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করার কাজে হাত দেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এক সৎ, দক্ষ কার্যকরী সিভিল সার্ভিস গঠন করা। তিনি প্রদেশগুলোকে জেলায় এবং জেলা গুলোকে থানায় বিভক্ত করেন। তাঁর সময় ২৩টি জেলা ছিল। কর্ণওয়ালিস কলকাতাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেন। এ সময় গ্রামাঞ্চলে জমিদারগণ পুলিশী দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন।

আইন বিধি কোড প্রবর্তন

প্রশাসনকে আইনের পথে পরিচালনার জন্যে কর্ণওয়ালিস তাঁর 'আইন বিধি কোড' প্রবর্তন করেন যা 'কর্ণওয়ালিস কোড' নামে পরিচিত। কর্ণওয়ালিসই সর্বপ্রথম কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে ব্যক্তিগত ব্যবসা কিংবা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কর্ণওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারির সংখ্যা হ্রাস করেন এবং তাদের সার্বক্ষণিক কাজ করার নির্দেশ দেন। কর্ণওয়ালিস রাজস্ব ও বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করে পৃথক কর্মচারিদের উপর এর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন।

বিচার বিভাগের উচ্চপদে ইংরেজদের নিয়োগ

কর্নওয়ালিসই বিচার বিভাগের উচ্চ পদগুলোতে ইংরেজ বিচারকদের নিয়োগের নিয়ম চালু করেন। তাছাড়া তিনি ফৌজদারী আইনকে আধুনিক করার চেষ্টা করেন। ফলে হিন্দু মুসলিম উভয়েই নিজ নিজ পক্ষে উকিল নিয়োগের অধিকার লাভ করে। কর্নওয়ালিস সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি ও বে-আইনী কাজের জন্য তাঁদের বিচার বিভাগের কাছে অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা করে আইনের শাসন প্রবর্তন করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন

ভূমি রাজস্ব: ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ভুল ত্রুটি থাকার কারণে লর্ড কর্নওয়ালিস তা সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের পাঁচসালা ও একসালা বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব বহুল পরিমাণে অনাদায়ী থাকে ও চাষীদের উপর শোষণ বেড়ে যায়। পাঁচসালা ও একসালা বন্দোবস্তের ভুল ত্রুটি নিরসনের জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস জমির 'দশসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন, যা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তে' পরিণত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ জমির স্থায়ী মালিক হন এবং তাঁদের দেয় করের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের দুর্দশা বেড়ে যায় ও জমির উন্নয়ন কমে যায়। এ ব্যবস্থায় সূর্যাস্ত আইনের বলে বহু জমিদারি নিলামে উঠে। জমিদারি কেনার মধ্য দিয়ে নতুন জমিদার শ্রেণী গড়ে উঠে। এভাবে এদেশে মধ্য বিত্ত শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটে।

লর্ড ওয়েলস্‌লির সময়ে শাসন ব্যবস্থা

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কোম্পানির গভর্নর হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্য শাসনের পরিবর্তে রাজ্য বিস্তারের দিকেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় তাঁর অবদান নিতান্তই সামান্য। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি বেশ কিছু সংস্কার করে গেছেন। তিনি ইংরেজ অধিকৃত স্থানে জমি জরিপ করার জন্য বুকাননকে নিযুক্ত করেন। তিনি এদেশের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার এ সব সংগৃহীত তথ্য থেকে কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হয়। ওয়েলেসলি বিচার ব্যবস্থার বেশ কিছু সংস্কার করেন।

কৃষি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা

লর্ড ওয়েলেসলি ভারতবর্ষে নবাগত ইংরেজ কর্মচারিদের শিক্ষার জন্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ স্থাপন করেন।

বেন্টিংকের সময় শাসন ব্যবস্থা

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উলিয়াম বেন্টিঙ্ক এদেশের বড়লাট হয়ে আসেন। প্রথমেই তিনি বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনে মনোযোগী হন। বেন্টিঙ্কই সর্বপ্রথমে এদেশীয়দের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তিনি কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত প্রাদেশিক আদালতগুলো তুলে দিয়ে জেলা কালেকটরের উপর ফৌজদারী মামলার বিচারের দায়িত্ব দেন। তিনি কয়েকটি জেলাকে একত্রিত করে একটি বিভাগ গঠন করেন। প্রতিটি বিভাগে একজন করে কমিশনার নিযুক্ত করেন। ডেপুটি ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদও সৃষ্টি করা হয়।

প্রশাসনিক ও সামাজিক সংস্কার

অতঃপর বেন্টিঙ্ক সমাজ সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেন। প্রথমেই তিনি 'সতীদাহ প্রথা' ও 'অনুমরণ' প্রথার বিলোপ সাধন করেন। এছাড়াও বেন্টিংক আরও অনেক অমানবিক প্রথা বাতিল করেন। তিনি ঠগী দস্যুদেরও দমন করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর সংস্কার অন্য কারও চেয়ে কম নয়। অনেক আগে থেকেই এদেশে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা প্রচলিত ছিল। ১৮১৩ সনের সনদ আইন দ্বারা কোম্পানি এদেশীয়দের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৎসরে একলক্ষ টাকা ব্যায় করতে বাধ্য ছিল। এ অর্থ শুধু মাত্র প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়িত হতো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বেন্টিঙ্কের চেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ ও বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকেন এদেশের জনগণের নিকট।

বেন্টিঙ্ক কোম্পানির আর্থিক উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছিলেন। তাই তিনি ব্যয় সংকোচন ও রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। বেন্টিঙ্ক কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য মালবে উৎপন্ন আফিমের উপর কর ধার্য করেন। যে সব জমি অবৈধভাবে নিষ্কর বলে দেখানো হয়, সে সব জমির উপর তিনি কর বসান।

মাদ্রাজ ও আগ্রায় 'রায়তওয়ারী প্রথার' প্রবর্তন করে তিনি কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি সিন্ধুর আমীর ও পাঞ্জাবের রনজিৎ সিংহের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করেন। বেন্টিঙ্কের এ সব ব্যবস্থা নেয়ার ফলে কোম্পানির ঘাটতি পূরণ হয়ে উদ্বৃত্ত থাকে।

এ ছাড়া বেন্টিঙ্ক এদেশের ভেতরে মাল চলাচলের উপর শুল্ক লোপ করেন। নদী ও সমুদ্রে জাহাজ চলাচলে উৎসাহ প্রদান করেন। চা ও কফি উৎপাদনের জন্য চা বাগান ও কফি বাগান স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করেন।

বৈদেশিক নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে প্রয়োজন বোধে এ নীতি ছাড়তেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এই নীতির মধ্য দিয়ে বেন্টিঙ্ক দেশীয় অনেক রাজ্যের উপর দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।

ডালহৌসীর সময়ের শাসন ব্যবস্থা

লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, বরং একজন শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রের প্রতি বিভাগেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রথমেই তিনি বড়লাটের কাজের চাপ কমানোর জন্য বাংলায় একজন ছোটলাট নিয়োগ করেন। বড়লাটের নির্দেশে ছোটলাট বাংলা শাসন করতেন। তাঁর সময়ে পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ডালহৌসী রাজ্যটির প্রশাসন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা নিজেই করেন। তিনি পাঞ্জাবের শাসনভার একজন কমিশনারের উপর ন্যস্ত করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ও জনকল্যাণমুখী কাজ

ডালহৌসী সামরিক বিভাগেও সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি বেঙ্গল আর্টিলারী সেনার সদর দপ্তর কলকাতা হতে মীরাটে স্থানান্তর করে উত্তরভারতে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করেন। তিনি গুর্খাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের নীতি নেন। তিনি বন্দীদেরকে ইন্সপেক্টরের অধীনে রাখার একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

লর্ড ডালহৌসী জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি পূর্তবিভাগ (P.W.D) গঠন করেন এবং এ দপ্তরকে সামরিক বোর্ড থেকে পৃথক করেন। এ দপ্তরের হাতে রাস্তাঘাট, পুল তৈরি ও জলসেচ ব্যবস্থা পরিচালনা দায়িত্ব দেয়া হয়। এ দপ্তরের উদ্যোগ গঙ্গাখাল খনন করা হয়। পাঞ্জাবেও বারি দোয়াব খালের কাজ আরম্ভ হয়। তাঁরই সময়ে কলকাতা হতে পেশোয়ার পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করা হয়।

রেল লাইন ও টেলিগ্রাফ স্থাপন

উপমহাদেশে রেলপথ নির্মাণের জন্য ডালহৌসীকে রেলপথের জনক বলা হয়। তাঁর সময়ে বোম্বাই হতে টানা পর্যন্ত রেললাইন চালু হয় (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ)। রেলের জন্য জমি বেল কোম্পানিকে বিনা মূল্যে দেয়া হয়।

ডালহৌসী এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয় (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। পরে এ লাইন লাহোর ও পেশোয়ার পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সব মিলে ৪ হাজার মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ ডাক বিভাগীয় আইন দ্বারা ডালহৌসী ডাক ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি করেন। তিনি পেনী পোস্ট কার্ড প্রথা চালু করেন। এদেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ডালহৌসী শিক্ষা সংস্কারে হাত দেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ তিনটি

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বেথুন -এর প্রচেষ্টায় বেথুন কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার কথাও ভাবেন।

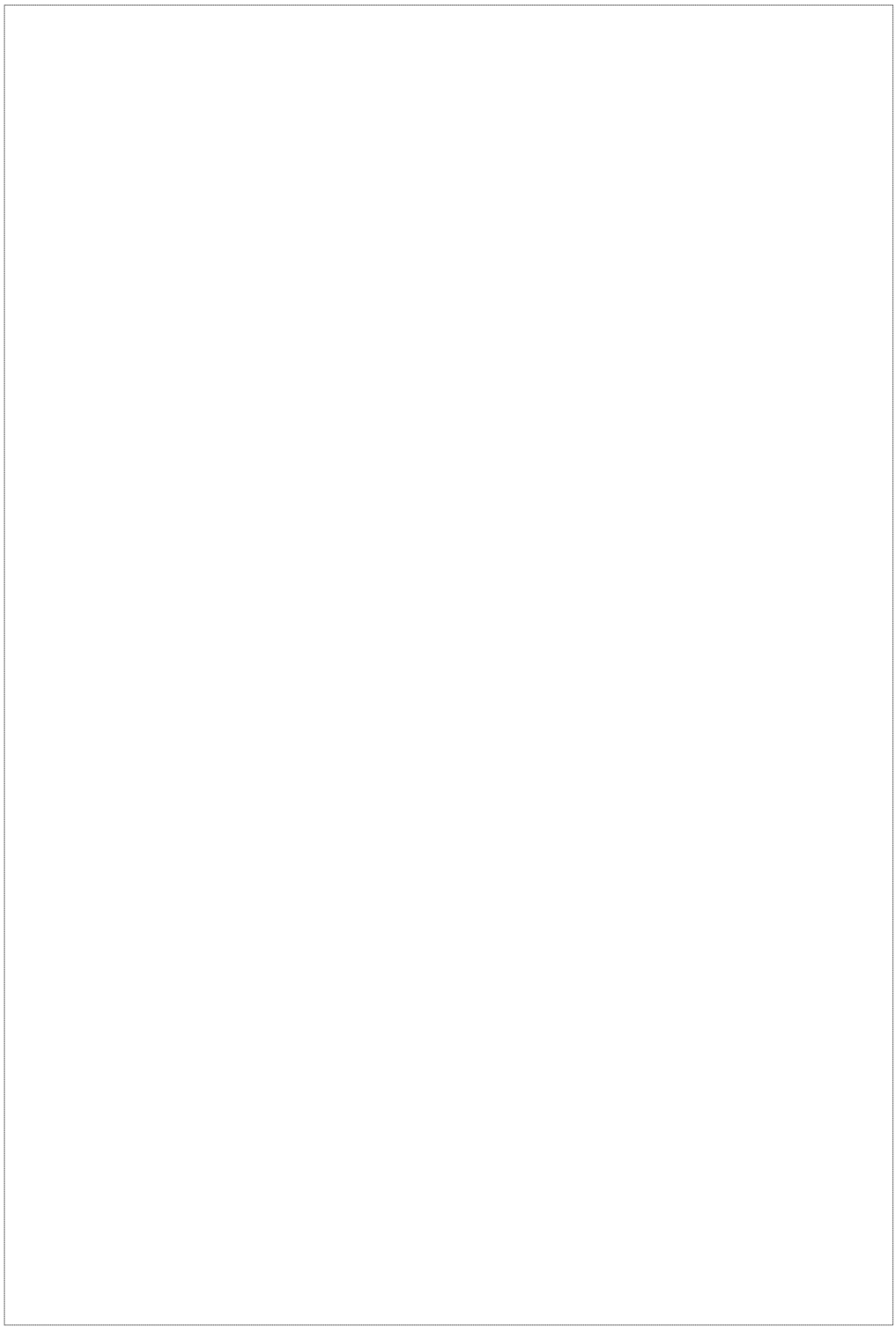

পাক ভারতে বৃটিশ রাজত্বের প্রসার

হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ আইন পাস

সমাজ সংস্কারক হিসাবে ডালহৌসী অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তিনি বিধবা বিবাহ আইন পাস করে হিন্দু বিয়েকে আইন সঙ্গত করেন। ডালহৌসী এমন একটি আইন পাস করেন যাতে এদেশীয়গণ ধর্মান্তরিত হলেও তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করতে পারে। বৈদেশিক নীতির দিক থেকে ডালহৌসী ছিলেন অত্যন্ত সফল শাসক। যদিও তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী তবুও উপমহাদেশে তিনিই এর স্থায়িত্ব ও দান করেন। ইংরেজ ক্ষমতার স্থায়িত্বের জন্য তিনি তিনটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন- প্রত্যক্ষযুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয়, স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা রাজ্য জয়, কুশাসন ও অরাজকতার অজুহাতে রাজ্য দখল।

পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা

বাংলায় যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হয়, তখন এদেশের কোন কোন ইংরেজ শাসকদের মধ্যে এ ধারণা জন্মেছিল যে এদেশের মানুষকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে এবং তার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারলে এদেশে তাঁদের শাসন ব্যবস্থা শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। তাঁরা আরও মনে করতেন যে, পাশ্চাত্য ভাষা ও শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে এদেশীয়দের মঙ্গল নিহিত। ফলে কোম্পানি আমলে এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছিল।

কিন্তু ইংরেজ শাসন এদেশে যে আধুনিক যুক্তিবাদ ও পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে তার ফল ছিল সুদূর প্রসারী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আধুনিক উদার চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করে যুক্তিবাদী হয়ে উঠে। ফলে, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি হয়। বাংলার কলকাতা হয়ে উঠে পাশ্চাত্য শিক্ষা চর্চা ও প্রসারের কেন্দ্র।

সার-সংক্ষেপ

কোম্পানির শাসন উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইংরেজ গভর্নরগণ ধীরে ধীরে একটি স্থিতিশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। তাদের শাসন নীতিতে একদিকে যেমন ইংরেজ ক্ষমতা বিস্তারের ব্যাপারে লক্ষ্য ছিল- অন্যদিকে জনকল্যাণের ব্যাপারেও ছিল তাদের দৃষ্টি। উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়েছিল কোম্পানির শাসনামলেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ করেন —
   ক. লর্ড বেন্টিঙ্ক খ. হেস্টিংস
   গ. ডালহৌসী ঘ. কর্ণওয়ালিস

২. সতীদাহ ও অনুমরণ প্রথার বিলোপকারী গভর্নর জেনারেলের নাম —
   ক. লর্ড বেন্টিঙ্ক খ. লর্ড ওয়েলেসলি
   গ. লর্ড ডালহৌসী ঘ. লর্ড কর্ণওয়ালিস

৩. কোন খ্রিস্টাব্দের আইনে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোম্পানি বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য ছিল —
   ক. ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে

৪. উপমহাদেশে রেললাইন চালু করা হয় —
   ক. ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. কোম্পানি আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. কোম্পানি আমলে পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৬ ঃ রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংস যে সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা বর্ণনা করুন।
২. কর্নওয়ালিসের সংস্কার সমূহের বিবরণ দিন।
৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি? এর ফলাফল বর্ণনা করুন।
৪. অধীনতামূলক মিত্রতা কি? লর্ড ওয়েলেসলি কিভাবে এই নীতি প্রয়োগ করেন।
৫. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের সামাজিক সংস্কার সমূহের বিবরণ দিন।
৬. স্বত্ববিলোপ নীতি কি? এই নীতি কে প্রবর্তন করেন? এ নীতি প্রয়োগের ফলে কোন দেশীয় রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।
৭. সমাজ সংস্কারক হিসেবে ডালহৌসির অবদান আলোচনা করুন।
৮. কোম্পানির শাসনামলে এদেশে কি কি সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়েছিল?
৯. এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলাফল বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ - ১	⇒	১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. ঘ
পাঠ - ২	⇒	১. ঘ	২. খ	৩. ক	৪. গ
পাঠ - ৩	⇒	১. খ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. ক
পাঠ - ৪	⇒	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. খ
পাঠ - ৫	⇒	১. খ	২. গ	৩. ঘ	৪. ক
পাঠ - ৬	⇒	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ক
পাঠ - ৭	⇒	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. খ